ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


আপনার দারুণ চেহারায় কি ওদের মুগ্ধ দৃষ্টি...
না এ হ'ল দারুণ মদুরা কাপড়ের অনন্য সৃষ্টি
মদুরার কাপড়
মদুরা কোটস-এর উৎপাদন

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক

খেলার আসর

বর্ষ ৩ ।। সংখ্যা ২০ ।। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

১৯৮২ সালে দিল্লির এশিয়ান গেমসে প্রজাতন্ত্র চীনের যোগদানের একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বেজিং-এ এক জাতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সময় ভারতীয় ওলিম্পিকের সভাপতি বিজয় মালহোত্রাকে আমন্ত্রণের সূত্রকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীন দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে খেলাধূলার সম্পর্ক নতুন করে শুরু হবে আশা করা যায়। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার সময় চীন তার দল নিয়ে যোগ দেয়। এরপর প্রায় চার বছরের মধ্যে আর কোন যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। ভারত থেকে অবশ্য ব্যাডমিণ্টন ও টেবল টেনিসের দল চীন গিয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে চীন ও ভারত মিলিত হয়েছে। চীন যদি শেষ পর্যন্ত ১৯৮২ এশিয়ান গেমসে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে আসে সেটা অবশ্যই সাম্প্রতিককালের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে নানা ক্ষেত্রে।

সম্পাদক ঃ অতুল মুখার্জি

শিল্প নির্দেশক ঃ নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা ঃ ১·৫০
বিমান মাশুল ঃ
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা







যা আছে

ফুটবল ঃ

বিশেষ রচনা ঃ

অন্যান্য ঃ

প্রচ্ছদ ঃ আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে গৌতম ও গুরদেব। ছবি ঃ সমর তরফদার

অন্যান্য ছবি ঃ অমিয় তরফদার, পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, শঙ্কর নাগ দাস, সমর তরফদার, স্পর্ট নিউজ এবং অন্যান্য।



দাপট দেখিয়ে মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড জিতেছে

মোহনবাগান—১ ঃ ইস্টবেঙ্গল—০

(গৌতম সরকার)

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে এক গোলে (বেশি গোলও হতে পারত) হারিয়ে মোহনবাগান আই এফ এ শিল্ড জয় করল। লিগও পেয়েছে এবার। গতবারও মোহনবাগান লিগ—শিল্ড দুটোই ঘরে তুলেছিল। এবার নিয়ে পর পর চার বছর মোহনবাগান শিল্ড জিতল। এর মধ্যে দু'বার যুগ্মবিজয়ী—৭৬-এ ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এবং ৭৮-এ আরারাতের সঙ্গে। মোহনবাগানের কাছে লিগ এসেছিল— ইস্টবেঙ্গল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করার ফলে। কিন্তু ওরা শিল্ড তুলল ইস্টবেঙ্গলকে দমিয়ে দিয়ে, রীতিমত দাপটের সঙ্গে কর্তৃত্ব করে বস্তুতপক্ষে ১৬ আগস্ট, রবিবার দিনটা ছিল মোহনবাগানেরই। চ্যাম্পিয়নের মতই ওরা এদিন খেলেছে। এবং জিতেছেও।

অথচ এমনটা যে হবে, ভাবা যায়নি। সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল, বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে, যে স্পিরিটেড ও দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছিল, শেষ পর্যন্ত যেভাবে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ৫—৪ গোলে (টাইব্রেকারে) এবং বিদেশী দলের বিপক্ষে লাল-হলুদের উজ্জীবিত লড়াইয়ের পূর্ব গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল, তার উপর ভিত্তি করে এই ধরণাটা অস্বাভাবিক ছিল না— ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলই ফেভারিট। তাই, হয়তো বা ওরা খানিকটা নিশ্চিন্তও ছিল শিল্ড জয় সম্পর্কে।

কিন্তু সব কিছু পাল্টে গেল খেলার প্রায় শুরু থেকেই। দোর্দণ্ড প্রতাপে মাঠে বিচরণ করতে লাগল মোহনবাগান। প্রকৃতপক্ষে, গত বেশ কয়েক বছরে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে মোহনবাগান এত ভালো খেলেনি, পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গলও বাজে খেলেনি এতটা।

প্রথম মিনিট থেকেই মোহনবাগান ম্যাচের লাগাম ধরে। এবং আক্রমনের থাবা বাড়িয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সে, যে কাজটা লাল হলুদ লিগের খেলায় করেছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মোহনবাগানের পক্ষে দু'গোল হয়ে যেত কিন্তু হয়নি। তার মধ্যে পায়াসের একটি শট লেফট ব্যাক ম্যাথুজ গোল লাইন থেকে ফিরিয়ে দেয়। মোহনবাগানের কয়েকজন খেলোয়াড় পেনাল্টির দাবি তোলে। ওদের মতে—বল ম্যাথুজের হাতে লেগেছে। প্রেস বক্স থেকে ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝা যায়নি। তবে রেফারি হাকিম ঘটনার কাছেই ছিলেন। তার বক্তব্যে—বল ম্যাথুজের থাইয়ে লেগেছে।

গোল না করতে পারলে কি হবে, গোলের গন্ধ, ততক্ষণে মোহনবাগানের প্লেয়াররা শুঁকে ফেলেছে। এবং ওদের আক্রমণও চলতে থাকে।

অবশেষে মোহনবাগান গোল পায় প্রথম হাফের ৩৮ মিনিটে। মানস একটি বল গৌতমকে দিয়ে ওর নিজের জায়গা ধরে ছুটতে আরম্ভ করে। গৌতম বলটা ধরে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে তরতর করে এগিয়ে যেতে থাকে। এবং তারপর, পেনাল্টি বক্সের কয়েক গজ বাইরে থেকে ওর পা ফুঁড়ে বেরোলো সেই সটটা, যেটা মোহনবাগানকে শিল্ড পাইয়ে দিল। ভাস্কর এক্ষেত্রে গোল লাইন থেকে কিছুটা বেরিয়েছিল। গৌতমের শটটা উঁচু থেকে হঠাৎ একটা গোত্তা খেয়ে নীচে নেমে জালে জড়িয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ এবং ভাস্করও সম্ভবত বুঝতে পারেনি, গৌতম এ-ধরনের একটি সট ওখান থেকে নেবে। ভাস্কর গোল লাইনে থাকলে হয়তো এ গোলটা বাঁচাতে পারত। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষেও সেমিফাইনালে ভাস্কর ঠিক এই ধরনের গোল খেয়েছে এবং লিগেও দু-একটা।

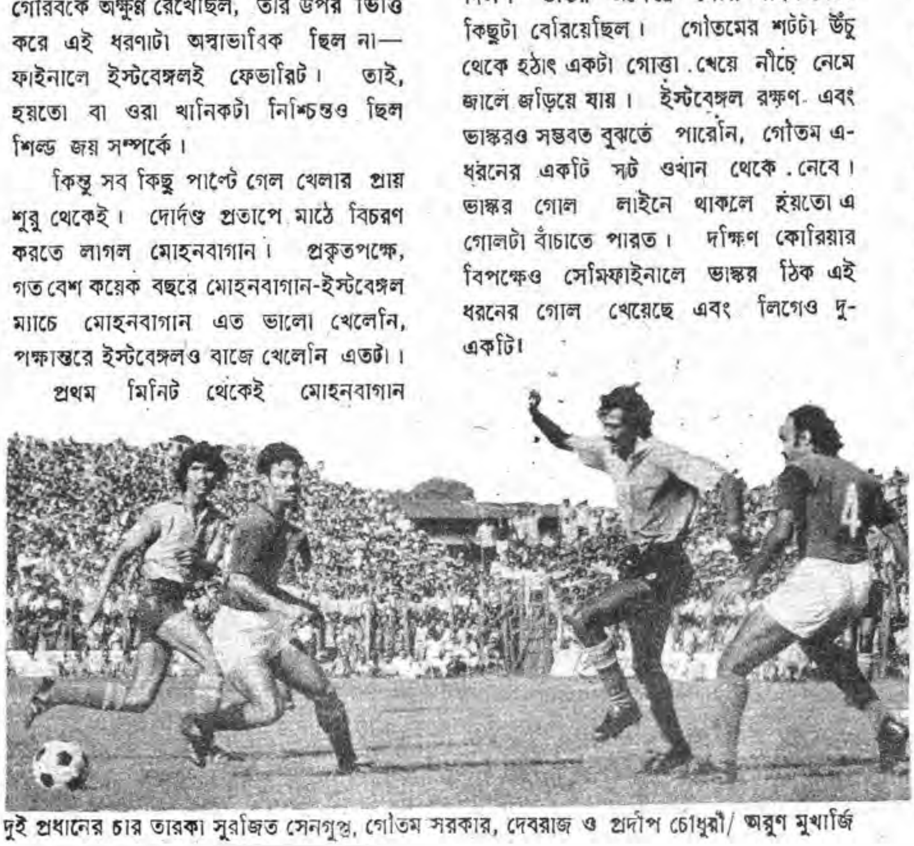


সেদিন গৌতম ছিল অপ্রতিরোধ্য / অরুণ মুখার্জি

গৌতম আজ মাঠের হিরো। এদিন সে কি খেলা খেলেছে, যারা দেখেনি, বোঝানো মুস্কিল। পুরো লিগে ওকে দেখেছি মোহনবাগান টিমটাকে টানতে, শিল্ডেও দেখলাম ওর দুর্দান্ত খেলা। ভাবতে অবাক লাগে, এহেন প্লেয়ারকে ফেলে রেখে ভারত '৭৮-এর এশিয়ান গেমস খেলে এল। কি অদ্ভুত বিচার!

গোল হবার আগে এবং পরেও, ইস্টবেঙ্গল মাঝে মাঝে খেলাটাকে ধরবার চেষ্টা করে এবং আক্রমণও করে মোহনবাগান অঞ্চলে। কিন্তু তেমন ফলপ্রসূ কিছু করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল টিমে দুটি পরিবর্তন হয়। হাফে দেবরাজের জায়গায় মিহির নামে। মিহিরকে প্রথম থেকেই খেলানো উচিত ছিল। আর স্ট্রাইকারে মনজিতের জায়গায় আসে সাব্বির আলি। কিন্তু সে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। মনজিত প্রথমার্ধে মন্দ খেলেনি এবং ওকে তোলাও ঠিক হয়নি। প্রথমার্ধে ওর একটি চমৎকার মাইনাস প্রতাপ কোন রকমে শুয়ে পড়ে ধরে।

সেকেণ্ড হাফে ইস্টবেঙ্গল গোল করার সুযোগও পায়। কিন্তু হরজিন্দর বারের উপর দিয়ে হেড করে সেই সহজ সুযোগটি হাতছাড়া করে। এছাড়া সুরজিত দুটি চকিত ও তৎপর সট নেয়। এবং তার মধ্যে একটি সট মোহনবাগানের পরিবর্তিত গোলরক্ষক শিবাজী



দুই প্রধানের চার তারকা সুরজিত সেনগুপ্ত, গৌতম সরকার, দেবরাজ ও প্রদীপ চৌধুরী/ অরুণ মুখার্জি

ব্যানার্জি ক্রসপিসের উপর দিয়ে তুলে দিয়ে আসন্ন বিপদ আটকায়। সুরজিত কলকাতার লিগে ইস্ট-মোহন ম্যাচে ঠিকমত খেলতে পারে না বলে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, এদিন সে সেই ধারণা অনেকটা ভেঙ্গেছে। ইস্টবেঙ্গল আক্রমণকে কিছুটা সচল রাখতে সুরজিতই মূল উদ্যোগী ছিল।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটাকে ধরে ইস্টবেঙ্গল মাঝে মাঝেই অ্যাটাকে ফিরে এলেও মোহনবাগানের হানা দেওয়া কিন্তু তাতে থমকে দাঁড়ায়নি। খেলার শেষ পর্যন্ত ওরা থাবা বাড়িয়ে গেছে ইস্টবেঙ্গলের দিকে। গোটা মোহনবাগান টিমটা এদিন এমন সংঘবদ্ধ ও উদ্দীপ্ত ফুটবল খেলেছে, যা বাস্তবিকই সদস্য সমর্থকদের অভিভূত করেছে। গৌতমের কথা আগেই লিখেছি। পায়াস, বিদেশ—অনবদ্য। বিদেশের এত ভালো খেলা এ মরশুমে ওর কাছ থেকে দেখিনি। ৩৩ বছরের শ্যাম প্রমাণ করেছে—টিমে ওর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। লিগের নায়ক মানস আজ অবশ্য কিছুটা অফ-কালার ছিল। গৌতমের যোগ্য সহযোগী হয়ে প্রসূন দাপট বিছিয়েছে। রক্ষণ দৃঢ় ছিল। এবং প্রতাপ। ৭ জুলাই সে গোলের নীচে দাঁড়িয়ে বিরাট আকৃতি ধারণ করেছিল। এবং এদিনও দেখলাম, যতক্ষণ মাঠে ছিল, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ওকে গোল আগলাতে। প্রথমার্ধে একটি বল ধরার জন্য ডেভিডের সঙ্গে ওর সংঘর্ষ হয়, খোঁড়াতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে, কিছু সময় কাটবার পরই ওকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। ওর জায়গায় গোল পাহারা দিতে আসে লিগে মাত্র একটি ম্যাচ খেলা 'প্রায় বাতিল' শিবাজী। এবং সেও রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে গোলরক্ষা করে গেল। আসলে, আমার মনে হয়েছে, এদিন মোহনবাগান প্লেয়ারদের মধ্যে একটা ঐশ্বরিক শক্তি ভর করেছিল। ওরা যা করেছে, করতে চেয়েছে—আপনা থেকেই তা যেন ঠিক হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ব্যাপারটা হয়েছে উল্টো।

গুরদেব মোটামুটি ভালো খেলেছে, মন্দ খেলেনি ম্যাথুজও। তবে, গৌতম যে পরিস্থিতিতে গোল করেছে, সেক্ষেত্রে, গুরদেবের গৌতমকে এতটা উঠে আসতে অ্যালাউ করা উচিত হয়নি। লিগে মনোরঞ্জন যে নিরঙ্কুশ দাপটে কর্তৃত্ব করেছে রক্ষণ অঞ্চলে, এদিন সে কর্তৃত্ব করতে পারেনি। হরজিন্দরের উপর ইস্ট-সমর্থকদের অনেক আশা ছিল, সে তা আজ পূরণ করতে পারেনি। লাল-হলুদের ৭ জুলাইয়ের উজ্জ্বল রঙ ১৬ আগস্ট শুরুতেই কেমন যেন ফিকে হয়ে গেল।

খেলা শেষ। মোহনবাগান মাঠের অর্ধেকাংশ জুড়ে তখন উল্লাস, বাকী অর্ধেক অঞ্চলটা নিশ্চুপ। কিছুক্ষণ ওরা মাথা নীচু করে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পরাজিত সৈনিকের গ্লানি নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। ৪ আগস্ট লিগে মহমেডানের সঙ্গে ড্র করে টিম চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে পড়ার পর হতাশা ও বেদনায় নুয়ে পড়ে। সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রিয় দলের উদ্দীপক জয়ে ওরা দ্বিগুণ উদ্দীপনা ফিরে পেল। শিল্ড কব্জা করার প্রেরণায় ওরা ফেটে পড়ল আগাম উল্লাসে। ওরা বদ্ধপরিকর ছিল—ওদের ইস্টবেঙ্গল শিল্ড পাবে। কিন্তু পেল না। ওদের আশা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ইস্টবেঙ্গল ৭৯-৮৩ লিগ পেল না এবং শিল্ডও না। অতএব অপেক্ষা নিয়ে ওদের তাকিয়ে থাকতে হবে পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোর দিকে।

২৭ বার ফাইনালে উঠে এবার নিয়ে মোহনবাগান শিল্ড ঘরে আনল ১৩ বার। ২৫ বার ফাইনালে ওঠা ইস্টবেঙ্গল এ যাবৎ



বল নিয়ে কাড়াকাড়ি, মোহনবাগানের শ্যাম থাপা ও হরজিন্দর/শংকর

শিল্ড জয়ীর তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছে ১৬ বার।

মোহনবাগান ঃ প্রতাপ ঘোষ (শিবাজী ব্যানার্জি), কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, শ্যামল ব্যানার্জি, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জি, মানস ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা (রঞ্জিত মুখার্জি), জেভিয়ার পায়াস ও বিদেশ বসু।

ইস্টবেঙ্গল ঃ ভাস্কর গাঙ্গুলি, চিন্ময় চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরদেব সিং, টমাস ম্যাথুজ, দেবরাজ (মিহির বসু), প্রশান্ত ব্যানার্জি, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, মনজিত সিং (সাব্বির আলি), ডেভিড উইলিয়ামস ও হরজিন্দর সিং।

রেফারি ঃ হাকিম।

লাইন্সম্যান ঃ সুধীন চ্যাটার্জি ও রবি চক্রবর্তী।



গো-ও-ল— ভাস্করকে ফাঁকি দিয়ে গৌতমের শট ইস্টবেঙ্গলের জালে গিয়ে আছড়ে পড়ল /অমিয় তরফদার

মোহনবাগানের সাফল্য বলে দিল শুধু তারকা সমাবেশে জেতা যায় না, চাই সুসংহত দল

আর শংকরণ ঃ আমি অরুণ ঘোষের গুণগ্রাহী। খেলোয়াড় জীবনে সাইড ব্যাক কিংবা স্টপার যেখানেই খেলতেন যতই কঠিন এবং উত্তেজনাকর ম্যাচ হোক জলে উঠতেন। যেন একটা চাবিকাঠি তাঁর মনের মধ্যে থাকে, সেটা ঘুরিয়ে যখন যেমন গুরুত্বের ম্যাচ তেমন খেলা যায়। মাঠে নামলেই বিপক্ষের খেলোয়াড়দের আস্থায় চিড় ধরাতেন তিনি, অথচ ওদের মধ্যে অনেকেই যার যার নিজের পজিশনে সেরাই ছিলেন।

এমন স্থিতধী, চিন্তাশীল ও গভীর আত্মপ্রত্যয় সমন্বিত মানুষ অরুণ ক্লাব কোচ হিসাবে সাফল্য পায়নি। মোহনবাগান তার অধীনে ইস্টবেঙ্গলের দাপটে ঢাকা পড়ে। এখন ইস্টবেঙ্গল তাই। অথচ গত জানুয়ারিতে ডুরাণ্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে হারানোর পর এবং তার আগে কোয়েম্বাটোরে ফেডারেশন কাপে দু দলের যুগ্মবিজয়ী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছিল সাফল্য আসছে। আসলে সেই ফেডারেশন কাপে ইস্টবেঙ্গলের তিন গোলে জেতা উচিত ছিল, এতো ভালো তারা খেলেছিল। সেই সময় অরুণের চরিত্রের আর একটা দিক আমার কাছে উন্মুক্ত হয়। ম্যাচ ড্র করার জন্য খেলোয়াড়দের কোন দোষ অরুণ দেননি, বলেছিলেন, 'আমাকে রাখাই হয়েছে ওদের নৈপুণ্যকে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।'

সত্যিকারের ভদ্রলোকের চেয়ে অরুণ যেন অনেক উপরে। তিনি কাউকেই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন না, তার খেলোয়াড়দের তো নয়ই। এই প্রশংসনীয় গুণ সত্ত্বেও মরশুমের গোড়ায়ই আমার মনে একটা ভয় উঁকি মেরেছে, লিগ জয়ের আশা বোধহয় ইস্টবেঙ্গলের অপূর্ণই থাকবে। তাই হয়েছে।

কারণ, অরুণের জানা উচিত, কলকাতার বড় ক্লাবগুলির খেলোয়াড়দের কোচিং-এর চেয়েও বড় বেশি দরকার শৃঙ্খলা আরোপ করা। যিনি ধমক ধামকের এবং অন্যান্য কায়দাকানুন না জানেন তার পক্ষে বাজীমাৎ করা সম্ভব নয়। সামান্য কোচিং হলেই যথেষ্ট। এই সব ক্লাবের খেলোয়াড়রা সকলেই প্রতিষ্ঠিত এবং স্কিলও তাদের কম নয়। সেখানে কিছু খেলোয়াড় আছে যাদের এখন ফর্ম নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পরিবর্তে নতুনদের আনা সম্ভব নয়, নতুন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষাও নয়। কারণ ব্যর্থতার ভয় প্রচণ্ড।

ভারতীয় দলের কোচিং-এর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ অরুণ নিশ্চয়ই জানতেন, সামান্য সময়ের কোচিং-এ দলকে সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব নয়। কারণ খেলোয়াড়রা এসেছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। সাইত নাগজী ও স্ট্যাফোর্ড কাপে দলের পরাজয় দলকে সুসংগঠিত করার কাজে আরও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে লিগের সময় কলকাতায় সপ্তাহে দুটি করে খেলা কি খেলোয়াড় কি কোচ কাউকেই নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না (অবশ্য বোম্বাইতে পনেরো দিনে একটি ম্যাচ খেলতে হয়)। এর উপর আছে



বিদেশ ইস্টবেঙ্গলের দু মুখী বাধা অতিক্রম করতে চাইছে/শংকর

সমর্থকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিয়ত চাপ।

এর ফলে ইস্টবেঙ্গল এতো ব্যয় করেও প্রয়োজনীয় খেলা খেলতে পারেনি। কোয়েম্বাটোর ফেডারেশন কাপের মতোই লিগে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে জয় হাতছানি দিয়ে গেছে। অবশ্য এজন্যে অরুণ নিশ্চয়ই ভাগ্যের দোহাই দেবেন না, দেয়া উচিতও নয়। কেউ কি



বল গোলের মাথায়, জালে। পরিবর্ত গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জির সামনেই প্রসূন, মনোরঞ্জন, সুব্রত ও হরজিন্দর/পাহাড়ী

মানসের সুযোগ সন্ধানী গোলটির অথবা প্রতাপের অপূর্ব গোল রক্ষার কথা অস্বীকার করতে পারবেন ? অথবা মহমেডান স্পোর্টিং রক্ষণভাগের সেই ইস্পাত দৃঢ় মনোবলের কথা।

ইস্টবেঙ্গলের মতো মহমেডানও এ বছর সেই একই অসুবিধায় ভুগছে। দুনিয়ায় এমন কি কেউ ছিলেন যিনি মহম্মদ হাবিব এবং কোচ রহমানকে এক মেরুতে সহাবস্থানে আনতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত রহমানকে নানা বিতর্কিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কলকাতাই ছাড়তে হলো।

বরং মরশুমের শুরু থেকেই আমার যেন মনে হয়েছে কাগজপত্রে দুর্বল মোহনবাগান আবার লিগ জয় করবে। অবশ্য কোন লেখায় এমন ভবিষ্যদ্বাণী আমি করিনি। আমার এই আশা কোন জ্যোতিষীর গণনা অথবা নিছক ভালোলাগা, ভালবাসার ব্যাপার নয়। অথবা তিন ক্লাবের কোচের দক্ষতার কোনও পার্থক্যবোধ থেকেও ঐ ধারণা জন্মায়নি।



ইস্টবেঙ্গল গোলমুখে পায়াস, গুরদেব, প্রশান্ত, মনোরঞ্জন ও ভাস্কর/পাহাড়ী

আমার বিশ্বাস কতকগুলি ঘটনাকে ভিত্তি করে। মোহনবাগানের যে দল গত বছর লিগে ও যুগ্মভাবে শিল্ড জয় করেছে তার মাত্র ২ জন বাদে আর সবাই এবারের নিয়মিত খেলোয়াড়। এরা সবাই নিজ পজিশনে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলির খেলোয়াড়দের চেয়ে কম যান না। জেভিয়ার পায়াস ও প্রতাপ ঘোষ নবাগত হলেও ক্রমেই পুরনোদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন।

কারণ পায়াস জানতো তার পেছনে একটি প্রত্যয়দৃঢ় রক্ষণভাগ আছে। আর প্রতাপও নির্ভয় ছিল তার সামনের খেলোয়াড়দের আস্থার জন্য।

আসলে মোহনবাগানের সাফল্য একটা শিক্ষা দিয়ে গেল বড় বড় তারকা থাকলেই হয় না, দেশের বিভিন্ন স্থানে থেকে প্রতিভা আমদানী করে খেতাব জেতা যায় না, সে জন্য চাই সুসংহত একটি দল। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেড়ান বিভিন্ন স্থান থেকে খেলোয়াড় এনেছে বটে, কিন্তু সময়টা কোথায় দলকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলার ? কোচ আর খেলোয়াড়দের একাত্ম হওয়া সাফল্যের একটি চাবিকাঠি।



শ্যামকে বাধা দিতে গিয়ে মনোরঞ্জন মাটিতে পড়ে। পাশেই জেভিয়ার পায়াস ও দেবরাজ/'পাহাড়ী

দ্বিজুদার আশেপাশে

শিল্ড ফাইনালের পর

দিগদর্শক ঃ দ্বিজুদার মনটা ভাল ছিল না। সেদিন গড়ের মাঠে মোহনবাগান ঃ ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখার পর তিনি ইডেন গার্ডেনে গিয়ে ঘণ্টা খানেক শুয়ে শুয়ে কাঁদবেন ঠিক করছিলেন। কেননা তরতাজা জোয়ান ছেলেদের যে চেহারা দেখেছেন তাতে তার দেশ সম্পর্কে হতাশা ছাড়া আর কিছু হচ্ছিল না। একটা খেলাকে নিয়ে ছোকরারা এতখানি বাড়াবাড়ি করবে কেন? এরপর আবার একজন ছোকরা দ্বিজুদাকে চিনতে পেরে তার মাথায় কলার খোসা ছুঁড়ে মেরেছিল দুবার। একজন ছুঁড়েছিল মাটির খুরি। দ্বিজুদা অবশ্য এসব ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এসব তো তার ভাগ্যে কম জোটেনি জীবনে। কতবার তার পিঠে, মাথায় ইঁট এসে পড়েছে তার তো সীমা সংখ্যা নেই। একবার খড়্গপুরে রেফারিগিরি করতে গিয়ে এক টিম সাত গোল খাওয়ার পর দ্বিজুদাকে শাসিয়েছিল—ফের যদি তিনি পক্ষপাতিত্ব দেখান তাহলে তাকে পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে কলকাতায় ফিরতে দেবে না। কিন্তু সেই টিম তারপর পর পর তিনটি গোল নিজেরা খেল, সেটা কি দ্বিজুদার দোষ? দ্বিজুদা বাঁশী বাজিয়ে তিনটি গোলই নথীভুক্ত করালেন। ফলে খেলার পর সেকি হাম্বি



তম্বি! তারপর পিঠে ইঁট, রদ্দা এসব তো হলই। কিন্তু আজ তার মন খুবই খারাপ, এর আগে তার মন এত খারাপ কখনো হয়েছিল বলে তার স্মরণে নেই। তিনি তার ভাইপো বিশেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দশটা টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন—যদি মোহনবাগান হারে তাহলে মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবেন। আবার মোহনবাগান যদি জেতে সেজন্য তার অন্য এক ভাইপো কলকে যদি কেঁদে বাড়ি মাথায় করে সেজন্যও ওই টাকাটি তার পকেটে রেখেছিলেন। কলকে আবার কেমন করে কে জানে ইস্ট-বেঙ্গলের সাপোর্টার। কলকের বয়স এখন সাত—আর সে বলে সে নাকি সারা জীবনই ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার!

দ্বিজুদা খেলার লাইনে এতদিন রয়েছেন কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না এই টুকুন একটা ছেলে যে ফুটবল কাকে বলে তাই জানে না, সে কেমন করে কোনো একটা দলের সাপোর্টার হয়। যাই হোক দ্বিজুদার দুঃখ সেজন্য হয়নি, দুঃখ হয়েছে কয়েকটি ছেলে আনন্দে ডগমগ হয়ে দ্বিজুদাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর থেকে তিনি আর সেই দশ টাকার নোটটিকে পকেটে খুঁজে পাননি। তিনি তাই মনের দুঃখে ইডেন গার্ডেনের দিকে যাচ্ছেন এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শামুবাবুর সঙ্গে। শামুবাবু হচ্ছেন কট্টর ইস্ট-বেঙ্গলের সাপোর্টার। দেখলেন তিনি-আকাশ-বাণী ভবনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর মাঝে মাঝেই কেঁপে কেঁপে উঠছেন। দ্বিজু-দার মনে হল বেচারা শামুবাবু! নিশ্চয় মনে খুব দুঃখ হওয়ায় কাঁদছেন। তিনি ভাবলেন, একে ইডেন গার্ডেনে নিয়ে গিয়ে দু'জনে মিলে কাঁদবেন। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন শামুবাবু কাঁদছেন না ছাই—ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক, হেরে গিয়ে কোথায় ভেউ ভেউ করে কাঁদবেন তা নয় এরকম পাগলের মত হাসছেন কেন? তিনি কি এখনও জানেন না কী হয়ে গেছে মাঠে? তিনি ভাবলেন, আহা—এখনও জানেন না। অথচ জানবেনই এক সময় না এক সময়। এসব খবর কি কি চাপা থাকে? হয় রেডিও, নয়ত খবরের কাগজে তারা বার করে দেবেই। এই ভেবে তিনি শামুবাবুর কাছে গিয়ে বললেন, শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। আপনার হৃদ্‌পিণ্ড ঠিকঠাক আছে তো? শামু-বাবু হাসতে হাসতে বললেন, যাক তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দ্বিজুদা, চলো কোথাও বসে টানিগে।

টানিগে? দ্বিজুদা বুঝতে পারেন না।

শামুবাবু বললেন, বুঝতে পারলেন না? টানাটানি বোঝেন না?

দ্বিজুদা তখন বললেন, আপনি হয়ত জানেন না শামুবাবু, ইস্টবেঙ্গল আজ……আজ ইস্টবেঙ্গল……। এটুকু বলেই থেমে গেলেন তিনি।

শামুবাবু হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, গোল খেয়েছে তো একটা? তা আর কি হয়েছে। খেলতে গেলে একবার খাবে দুবার দেবে। এই তো জীবন!

দ্বিজুদা বললেন, কিন্তু আপনার ক্লাব হেরে যাওয়ায় আপনি এমন অমানুষের মত হাসছেন কেন?

শামুবাবু বললেন, হাসছি তার কারণ আছে। আগে ইস্টবেঙ্গল হেরে গেলে বড় দুঃখ হত। কান্নাকাটি করতাম, গুম হয়ে থাকতাম, মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকত। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম একটা কাণ্ড করলে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না।

দ্বিজুদা বললেন, কী কাণ্ড?

শামুবাবু বললেন, আমি কুমির দাসের সঙ্গে আড়াইশো টাকা বাজী রেখেছিলাম ইস্টবেঙ্গল হারবে বলে, ও বলেছিল জিতবে। এখন ইস্টবেঙ্গল জিতলে আমাকে আড়াই-শো টাকা দিতে হত। কিন্তু হেরে যাওয়ায় কুমির দাসই আমাকে ওই টাকা দিয়েছে! এখন, ইস্টবেঙ্গল হারাতে আমার লাভ দাঁড়িয়েছে দুশো পঞ্চাশ টাকা!

দ্বিজুদা বললেন, আর যদি ইস্টবেঙ্গল জিতে যেত?

শামুবাবু বললেন, ইস্টবেঙ্গল জিতলে এত ফুর্তি হত যে আড়াইশো টাকা গচ্চা যাওয়া তার তুলনায় তুচ্ছ মনে হত!

দ্বিজুদা বললেন, এখনও তো দারুণ ফুর্তি দেখা যাচ্ছে।

শামুবাবু বললেন, ইস্টবেঙ্গল জিতলে এর চাইতে দশগুণ ফুর্তি হত! বুঝলেন, এর চাইতে দশগুণ!



ইংল্যাণ্ড সফরকারী ১৯৩২ এর ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ (বাঁ দিক থেকে, দাঁড়িয়ে) লাল সিং, পালিয়া, জেহাঙ্গীর খাঁ, নিসার, অমর সিং, কাপাডিয়া, গোদাম্বে, ঘুলাম মহম্মদ আর নাভলে : (চেয়ারে বসে) উয়াজির আলি, সি কে নাইডু, ম্যানেজার মেজর রিকেটস, অধিনায়ক পোরবন্দরের মহারাজা, সহ-অধিনায়ক লিমডির রাজকুমার, নজির আলি আর যোগিন্দর সিং ; (মাটিতে বসে) নাওমাল, কোলা আর নরি মার্শাল।

নাভলে ঃ ৪৭ বছর আগে ভারতের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বপ্রথম স্ট্রাইক নিয়েছিলেন

সুব্রত সরকার ঃ সাতচল্লিশ বছর আগে ভারতের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে যে ব্যাটসম্যান সর্বপ্রথম স্ট্রাইক নিয়েছিলেন, এই মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি মারা গেলেন। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২-এর লর্ডস টেস্টে ভারতের ব্যাটিং সূচনা করেছিলেন রাজপুতানার জনার্দন নাভলে আর সিন্ধের জেন্টমান নাওমাল। বোম্বাই-এর ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াতে নাওমালকে এখনও মাঝে মধ্যে দেখা যায় : পরলোকে চলে গেলেন পুনেবাসী নাভলে।

লর্ডসের সেই খেলা ছাড়া এদেশের মাটিতে প্রথম টেস্টেও ব্যাটিং ওপেন করেছিলেন নাভলে। ১৯৩৩-এর ডিসেম্বরে বোম্বাই জিমখানা মাঠে নাভলের পার্টনার ছিলেন ওয়াজির (অন্য মতে উজির) আলি। জীবনে মাত্র এই দুটি টেস্টেই খেলেছিলেন নাভলে—চারটি ইংনিসে তার সর্বোচ্চ রান ছিল ১৩। প্রথম উইকেট জুটিতে বোম্বাই টেস্টে প্রথম ইনিংসে নাভলে আর ওয়াজির ৪৪ রান করেন।

ব্যাটিং ওপেন করলেও নাভলের দলে স্থান উইকেটরক্ষক হিসাবে। উইসডেনের ১৯৩৩ সংস্করণে আগের মরশুমের ভারতীয় দলের সমালোচনায় লেখা হয়েছিল ঃ 'নাভলের মধ্যে ভারতীয়রা এক প্রথম-সারির উইকেটকিপার পেয়েছিল—সব দিক দিয়েই যিনি খুব চটপটে ছিলেন···।' নাভলে সি কে নাইডুর খুব প্রিয় ছিলেন। আগেকার দিনের কিছু সমালোচক এখনও মনে করেন, নাভলে বা দিলাওয়ার হুসেনের মতন উইকেটকিপার ভারতে আর হয়নি।

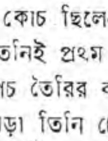
সরকারিভাবে জনার্দন (জে জি) নাভলের জন্ম তারিখ ১৯০২-এর ৭ ডিসেম্বর, অর্থাৎ মৃত্যুকালে তার বয়স ৭৮ বছর। বত্রিশের ইংল্যাণ্ড সফরের সময় তার বয়স ত্রিশ পূর্ণ হতে চলেছে। সেবার প্রথম-শ্রেণীর খেলায় নাভলে ছ'শোর বেশি রান করেন। সর্বোচ্চ লিভারপুলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ৬৪। এই ইনিংসে সি কে নাইডু-নাভলে জুটি তৃতীয় উইকেটে ১৪৭ রান যোগ দেন।

নাভলের সময় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট এদেশে কমই খেলা হত। নাভলে বড় ম্যাচে খেলবার সুযোগ প্রথম পান ১৯২৬-২৭'এ সফরকারী এম সি সি দলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুতানা-সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া একাদশের হয়ে। ১৯৩৪-এ রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতা চালু হলেও নাভলে এই জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে মাত্র একটি ম্যাচই খেলেন—গোয়ালিয়রের হয়ে ১৯৪৩-৪৪ সিজনে। তখন তার বয়স চল্লিশ পার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্নামেণ্টে নাভলে নিয়মিত হিন্দু দলের হয়ে খেলতেন। এই প্রতিযোগিতায় তার সর্বোচ্চ রান ৯৬।

ইংল্যাণ্ড সফরকারী ১৯৩২-এর ভারতীয় দলের সদস্যদের মধ্যে আজ মাত্র তিন-চারজন জীবিত। নাভলের মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক আগে মারা যান সেবারকার দলের আরেক খেলোয়াড়—মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান নরি মার্শাল। তিনি অবশ্য সেই সফরে, বা পরেও, টেস্ট খেলবার সুযোগ পাননি। তা না হলেও ১৯৩২-এ ইংল্যাণ্ডে মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসাবে তিনি দুটি শতরান করেন। একটি বার্মিংহামে ওয়ার্কশায়ারের মতন শক্তিশালী কাউণ্টি দলের বিরুদ্ধে—অপরাজিত ১০২।

নরি মার্শাল বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলারে পারসীদের হয়ে খেলা ছাড়া রঞ্জি ট্রফির প্রথম সিজনে ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ার হয়ে খেলেন। বয়সে তিনি নাভলের থেকে দু' বছরের ছোট ছিলেন। ১৯৩৬-৩৭'এ যখন নওয়ানগর দল রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয় সেবার মার্শাল অমর সিং, মানকড়, কোলা প্রমুখ প্লেয়ারদের মতন বিজয়ী দলের সদস্য ছিলেন।

খেলোয়াড় জীবন শেষ হওয়ার পর নরি মার্শাল পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কোচ ছিলেন। প্যাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসে তিনিই প্রথম ক্রিকেট প্রশিক্ষক ছিলেন। তাছাড়া অনেক মহলে পিচ তৈরির ব্যাপারেও তাকে বিশেষজ্ঞ বলে মনে করা হত। ব্যাটিং ছাড়া তিনি চেঞ্জ বোলার হিসাবে অনেক ভাল উইকেট দখল করেছিলেন।



বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্সে ভারতের সকলেই সর্বশেষ স্থান পেল

কানাডা থেকে অশোক মুখোপাধ্যায়

মন্ট্রিয়লে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্সের আসর বসেছিল আগস্টের শেষদিকে। '৮০ সালে মস্কোতে ওলিম্পিক হবে জুলাই মাসে, তার মানে প্রায় একবছর আগে বিশ্বের সেরা অ্যাথলিটরা নিজেদের যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সব দেশের সব সেরারাই যে উপস্থিত ছিলেন তা নয়, বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ব্রিটেনের সেবেস্টিয়ান কো-র অনুপস্থিতি। হালফিল কো ৮০০ মিটার দৌড়ে নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছে।

ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন ঠিক করেছে প্রতি দু'বছর অন্তর বিশ্বকাপ অ্যাথলেটিক্সের আয়োজন করা হবে। প্রথম-বার হয়েছিল '৭৯ সালে পশ্চিম জার্মানির ডুসেলডর্ফ-এ, দ্বিতীয়বার হল মন্ট্রিয়লে। এভাবে চলবে—অর্থাৎ প্রতি ওলিম্পিকের একবছর আগে ও ওলিম্পিকের পরের বছর প্রতিযোগিতা হবে। সারা পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে আটটি অঞ্চলে—পাঁচটি মহাদেশ আর তিনটি অ্যাথলেটিক্সের সুপার পাওয়ার দেশ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউ-নিয়ন ও জার্মান ডেমক্রেটিক রিপাবলিক (পূর্ব জার্মানি) প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।



পূর্বজার্মানির বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী মারিতা কখ্‌ (বাঁয়ে) মেয়েদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতে ব্যাটন নিচ্ছে ব্রিজিট কোহেনের হাত থেকে

তিনটি 'সুপার পাওয়ার' আর ইউরোপ ও আমেরিকা, এই দুই মহাদেশের সাফল্য প্রায় পূর্ব নির্ধারিত ছিল, এশিয়া বা আফ্রিকা কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারে সেটাই দেখার ছিল। পুরুষ বিভাগে আফ্রিকা ষষ্ঠ ও মহিলা বিভাগে সপ্তম স্থান পেয়েছে। সোনা পেয়েছে তিনটি—৪০০ মিটারে হাসান কাশীফ (৩ মিঃ ৪৫.৩৯ সেঃ), ৫০০০ মিটারে মিরুটা ইয়েফতের (১৩ মিঃ ৩৫.৯ সেঃ), ম্যারাথনে কেবেদজ বালশ্চা (২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড) ; সবকটিই পুরুষ বিভাগের ইভেণ্ট। এছাড়া ব্রোঞ্জ পেয়েছে তিনটি।



রেনাল্ডো নেহেমিয়া (আমেরিকা) ১১০ মিটার হার্ডলস বিজয়ী

আর পদক প্রাপ্তির তালিকায় এশিয়ার নাম কোথাও নেই। পুরুষ ও মহিলা দুটি বিভাগেই তারা সবশেষ স্থান পেয়েছে। কিন্তু এশিয়ার সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে এবার অনেক আগাম আলোচনা হয়েছিল। জাপান ও চীনের প্রতিনিধিরাও যে সকলেই খালি হাতে ফিরবে, এতটা কেউ আশঙ্কা করেনি।

কম্যুনিস্ট চীন মাত্র গত বছর ইণ্টার-ন্যাশনাল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সদস্যপদ পেয়েছে। চীন থেকে আটজন এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া বা পূর্ব জার্মানিতে স্পোর্টসকে যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়, আরেক কম্যুনিস্ট দেশের কাছেও তেমন প্রত্যাশা ছিল। অন্তত চীন সরকার যেভাবে প্রচার চালিয়ে ছিল, তাতে মনে হয়েছিল এক্ষুণি না হলেও চীন হয়ত অদূর ভবিষ্যতে চতুর্থ সুপার পাওয়ার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, এবং তার খানিকটা আভাস অন্তত বিশ্বকাপে দেখা যাবে।

কিন্তু সাফল্যের দিক থেকে চীন, জাপান কিংবা ভারতের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এশিয়ার প্রতিনিধি আটজন প্রতিযোগিতায় এইটথ্‌ হয়েছে।

ভারতের প্রতিনিধিরা কে কেমন করেছে ? মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়ে বাঙলার রীতা সেনের সময় লেগেছে ৫৭'৭৬ সেকেণ্ড। প্রথম স্থান প্রত্যাশিতভাবেই সারিতা কখ পেয়েছে। সারিতা-র লেগেছে ৪৮'৯৭ সেকেণ্ড। প্রায় ৯ সেকেণ্ডের ব্যবধান —এই ব্যবধান ঘোচাতে আমাদের কতদিন লাগবে কে জানে ? পুরুষদের লং জাম্পে ভারতের সুরেশবাবু সপ্তম স্থান পেয়েছে (৭'৪১ মি), প্রথম স্থান পেয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ল্যারি মিরিক্স (৮'৫২ মি)। পুরুষদের ৫০০ মিটার দৌড়ে ভারতের গোপাল সাইনির লেগেছে ১৪ মিনিট ২৬'৮ সেকেণ্ড ; তিনিই ফিনিশিং পয়েণ্টে সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম হয়েছে ইথিয়োপিয়ার মিরুটা ইয়েফ-তের (১৩ মিনিট ৩৫'৯ সেকেণ্ড)। মেয়েদের ৮০০ মিটারে প্রথম হয়েছে বালগেরিয়ার নিকোলিনা, সময় লেগেছিল ২ মিনিট ০'৬ সেকেণ্ড। গীতা জুৎসি অষ্টম স্থান পেয়েছে ২ মিনিট ১০'৪ সেকেণ্ডে। পুরুষদের ১৫০০ মিটার দৌড়ে ভারতের রতন সিংও অষ্টম স্থানাধিকারী (৩ মিনিট ৫২'৪ সেকেণ্ড), প্রথম স্থান পেয়েছে পশ্চিম জার্মানির

টমাস ওয়েসিংঘেজ (৩ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড)।

তিনদিন ধরে এতবড় একটা প্রতিযোগিতা হয়ে গেল মণ্ট্রিয়েলে, কিন্তু সেখানকার জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কি? ভাবতে অবাক লাগে '৭৬-এর ওলিম্পিক যে স্টেডিয়ামে হয়েছিল, সেই বিরাট স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন দিবসে প্রায় ফাঁকা পড়েছিল, উপস্থিতির সংখ্যা মাত্র ১২,৫৬৭ জন। অনুষ্ঠানের ডিরেক্টর ল্যারি এলড্রিজের মতে মণ্ট্রিয়লের লোকজন বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা কি হচ্ছে, বা এর গুরুত্ব কতটা? প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবার পর থেকে বেশ কিছু লোক টেলিফোনে জানতে চেয়েছে, ফাইনালটা কবে হচ্ছে, তার টিকিট পাওয়া যাবে কি না? কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় 'হিট' বলে কিছু ছিল না, সবই ফাইনাল। বিশ্বের বাছাই করা সেরা অ্যাথলিটরা যে অংশ নিতে এসেছিল, এ খবরটাও বহু মণ্ট্রিয়লবাসী জেনেছে প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর।



জোয়াও ডি অলিভেরা (ব্রাজিল) ট্রিপল জাম্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ী

চুঁচুড়ায় জাতীয় জুনিয়র ভলিবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় জুনিয়র ভলিবলের আসর এবার বসবে চুঁচুড়ায়। এর মধ্যে সমস্ত রকম প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। খেলা হবে জানুয়ারিতে।

টেবল টেনিস প্রসঙ্গে

চন্দননগরের ছোট টেবল টেনিস খেলোয়াড় দীনেশ রক্ষিতকে ওর ক্লাব দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। দীনেশ এবার যোধপুরে ইণ্ট্যাব কাপ প্রতিযোগিতার সাব জুনিয়র ডাবলসে ইন্দ্রজিত ঘোষের সঙ্গে জুটি বেঁধে বিজয়ী হয়েছে। দীনেশ সিঙ্গলসে চতুর্থ স্থান পেলেও শীর্ষ বাছাই বিবেক অরোরাকে হারিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

ক্লাব সম্পাদক মলয় দাস জানান, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ছোট ছোট খেলোয়াড়দের নানা খেলাধূলায় যে তালিম দিচ্ছে দীনেশ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দীনেশ হুগলী জেলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। আগেও 'নেহরু ট্যালেণ্ট সার্চ' প্রতিযোগিতায় 'মেরিট প্রাইজ' লাভ করে সাফল্য দেখিয়েছে।



দীনেশ রক্ষিত। যোধপুরে ইণ্ট্যাব টেবল টেনিসে সাব জুনিয়র ডাবলসে বিজয়ীর অন্যতম। ওর জুটি ছিল ইন্দ্রজিৎ ঘোষ

চন্দননগর ফুটবল লিগ

চন্দননগর ফুটবল লিগে এবার বেশ কয়েকটি ক্লাব অবনমনের আতঙ্কে ভুগছে। এবার তিনটি দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবে। বারোটি দলের মধ্যে বয়েজ ক্লাব ও সি সি ক্লাব এই দুটি ক্লাবই বলতে গেলে শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই চালিয়েছে। এক সময় এমন পর্যায় এসে পৌঁছোয় যে বাকি আটটি দল কে যে নেমে যাওয়ার খপ্পরে পড়বে তা বোঝাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। তারপরেই টেবলের খেলা শুরু হয়ে যায়। শহরে পর পর কয়েকটি খুনের ঘটনায় খেলা কয়েকদিন বন্ধ রাখতে হয়। তার উপর রেফারির অভাবে বেশ কয়েকটি খেলা পণ্ডও হয়ে যায়।

চুঁচুড়ায় খেলা পণ্ড

চুঁচুড়ায় হুগলী জেলা ফুটবল লিগে বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব ও রাজেন্দ্র স্মৃতি সংঘের খেলাটি মাঝপথে ভণ্ডুল হয়ে যায়। বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব ওই সময় পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। ওই খেলায় মাঠ ছিল দর্শকে ঠাসা। খেলা শেষ হতে মিনিট দশেক বাকি ছিল—সেই সময় মাঠে লোক ঢুকে পড়ায় রেফারি বাধ্য হয়ে খেলা বন্ধ করে দেন।

ব্রাজিল বিশ্বকাপে যাবার ওয়াকওভার পেয়ে গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশন (সি এস এফ) সম্প্রতি ১৯৮২-র বিশ্বকাপ ফুটবলের আঞ্চলিক ক্রীড়া তালিকা প্রস্তুত করেছে। এই মহাদেশের দশটি দেশের মধ্যে ৪টি দেশ এবার চূড়ান্ত রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা পাবে, যার মধ্যে ১৯৭৮-এর চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা স্বভাবতই চূড়ান্ত রাউণ্ডে ইতিমধ্যেই চলে গেছে।

বাকি ৯টি দেশকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তাতে ধরে নেওয়া যায় ব্রাজিলও উঠে গেছে। কারণ এক নম্বর গ্রুপে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্বী ২টি দল হলো বলিভিয়া ও ভেনেজুয়েলা। গ্রুপ দুইতে আছে পেরু, উরুগুয়ে, কলম্বিয়া এবং গ্রুপ তিন-এ প্যারাগুয়ে, চিলি ও ইকোয়েডর।

সি এস এফ আরও স্থির করেছে, এই মহাদেশের প্রি-ওলিম্পিক ফুটবল ১৯৮০-র ২০ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে। আর্জেণ্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, পেরু, চিলি, উরুগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা এই আটটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে খেলানো হবে। প্রত্যেক গ্রুপের খেলার পর প্রথম দুটি দল মস্কো ওলিম্পিকের মূল আসরে খেলার যোগ্যতা পাবে। ৩০ সেপ্টেম্বর প্রি-ওলিম্পিকের ক্রীড়া তালিকা তৈরি হবে।



রাজহরা স্টেডিয়াম থেকে হাঁটা শুরু করেছে প্রদীপ শুকল

সংগ্রামী ওয়াকার প্রদীপ শুকল

রাজহরা (মধ্যপ্রদেশ) থেকে গাজি এম আনসার ঃ ভিলাই স্টিল প্লান্টের ওয়াকার ২৪ বছরের যুবক প্রদীপ শুকলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ঘর বলতে রাজহরা ক্লাবের গুদাম। টিনের চাল শতছিদ্র, জল পড়া আটকানোর জন্য চাঁচ ধরিয়ে প্রদীপের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ভাঙা দরজায় ঠেলা মারলেই হাট। ইঁদুর ছুঁচো মাকড়সার জাল আর আরশোলার অরকেস্ট্রা। দু'ধাপ সামনেই ময়লা ড্রেন। মশা আর মাছির জন্য ওয়েলকাম প্লেস। প্রদীপের ঘরে গোটা দুয়েক টেবিল, একটা চেয়ার. একটা ছোট আয়না, কয়েকটা শাম্পুর শিশি, কলগেট, বোরোলিন আর দড়ির খাটিয়া, সেই নিয়ে প্রদীপ মুরগীর মত বাস করছে।

সদা-হাস্য নিরহংকারী প্রদীপ ভিলাই স্টিলের ওয়াকার হিসাবে সারা ভারতে পরিচিত। ওর বাবা ভিলাই স্টিলে চার্জ-ম্যান। উনি আগে ইণ্ডিয়ান নেভিতে চাকরি করতেন। প্রদীপের জন্ম বোম্বাইয়ে হলেও শৈশব কেটেছে মুর্শিদাবাদের লালগোলাতে। ক্লাশ টেন অবধি পড়েছে দুর্গাপুরের বিজন মালটিপারপাস স্কুলে।

পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের সময়ে ও ভিলাই-এ বাবার কাছে আসে এবং বি ই সি কোম্পানিতে প্রথমে হেলপার ও পরে টার্নারের কাজ নেয়। খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ—কোম্পানির হয়ে একদিন ভিলাই-য়ের বার্ষিক ক্রীড়ায় দৌড়োয়। ফার্স্ট হয়ে একটা চামড়ার ব্যাগ পায়। সেই থেকে দিনে ডিউটি, রাত্রে ভিলাইয়ের রাস্তায় প্র্যাকটিস। একদিন মেসিন ছেড়ে দিয়ে (বাবার অমতেই) কোচ কে জি আচারিয়ার কাছে তালিম নিতে থাকে ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় দু'হাত কপালে ঠেকায়।

১৯৭৬-এ আন্তঃইস্পাত কম্পিটিশনে ও টাটাতে হাঁটায় (ওয়াকিং-এ) ব্রোঞ্জ পায়। এখান থেকেই সাফল্য শুরু. ১৯৭৮-এ ভিলাই-এ আন্তঃ ইস্পাত কম্পিটিশনে প্রদীপ ২০ কিলোমিটার ওয়াকিং ১ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে শেষ করে সোনা জেতে। এর-পরেই ১৯৭৮-এর ২২ এপ্রিল ভিলাই স্টিলে চাকরি পায় খালাসি হিসাবে। এবারে ও হায়ার-সেকেণ্ডারি পাশ করে পি ওয়ান থেকে পি ফোর অর্থাৎ গ্রেড টুতে উঠলো। ওর ইচ্ছা সোসিওলজিতে এম এ করে লেবার ওয়েল-ফেয়ার অফিসার হবে।

প্রদীপ এ বছরের জানুয়ারিতে বাঙ্গালোরের কান্তিরব স্টেডিয়াম থেকে ওয়াকিং-এ এনেছে একটা সোনা। দক্ষিণের এই প্রতিযোগিতায় ভারত ও শ্রীলঙ্কার ২৫ জন অ্যাথলিট সমেত মোট প্রতিযোগী ছিল ৫৫৬। ও ওখানে ২০ কিমি পথ ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে শেষ করে। তাছাড়া বাঙ্গালোরে সি প্রসন্ন কুমার মেমোরিয়াল অ্যাথলেটিক্স মিট থেকে ২০ কিমি, ১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিটে শেষ করে এনেছে দ্বিতীয় সোনা। তাছাড়া কিছু-দিন আগেই গোয়াতে ইন্টার মাইন্স কম্পিটি-শনে ১০ কিমি রাস্তা ৫২ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে পার হয়ে নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে সোনা জেতে। চতুর্থ সোনাটিও ওয়াকিং-এ পেয়েছে মধ্যপ্রদেশ থেকে। গত মাসে দুর্গাপুরে ইন্টার ওর মাইন্স কম্পিটিশনে প্রদীপ ২০ কিমি রাস্তা ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে শেষ করে সোনা এনেছে। প্রদীপ এবার স্টিল স্পোর্টস বোর্ড থেকেও সিলেকশন পেয়েছিল, কিন্তু যেতে পারেনি।

অবহেলিত প্রদীপ রাজহরাতে আছে পাহাড়ী এলাকায় প্র্যাকটিস এবং সুজয় ঘোষের গাইডেন্সের জন্য। সকাল, দুপুর, বিকেল তিনবারে প্র্যাকটিস চলছে ৩০ কিলোমিটার, দ্বিতীয় দিনে ১৫ কিমি দুবারে, তৃতীয় দিনে ২৫ কিমি তিনবারে। সপ্তাহের পঞ্চম দিনে ৪৬ কিমি পথ হাঁটে একবারেই। মাসে দু'দিন বিশ্রাম বা সামান্য ওয়ার্ম-আপ। গড়ে প্রতি মাসে ১৫০ কিলোমিটার রাস্তা হাঁটে প্রদীপ। হেঁটে হেঁটে বহুদূর চলে যায়। সঙ্গে থাকে ঘড়ি, ছোট ডায়েরি আর উট। যে দুই বন্ধু দু'বেলাই ওর সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে চলে—তারা রঞ্জিত, আর বাপী। এর ওপর ঘোষদাকে লুকিয়ে রাতে প্র্যাকটিস করে গ্রাউণ্ডে। আগামী ন্যাশনালে ও লক্ষ্ণৌতে হাকাম সিংকে হারাতে চায়।

প্রদীপের ডায়েট খুবই সাদাসিধে, আগে দুধ খেতো। এখন ওই মশা মাছি চামচিকের রাজ্যে এক হাঁটু নোংরা ঠেলে মুখে নাকে কাপড় দিয়ে কোনই দুধওয়ালা যায় না। চিঁড়ে, ছোলা, ভেজা বাদাম, কলা, ছাগলের ঠ্যাং-এর জুস খায়। আর খায় ডাল, ভাত, ডিম, আলুর তরকারী।

পয়সার বড্ড অভাব, জুতোগুলো দু'মাসও জ্যান্ত থাকে না তাই আঠা দিয়ে তাপ্পি মারতে হয়। বোনদের বিয়ে দিতে হবে, ধার দেনা শোধ করতে করতেই বছর কাবার।

কি ভালো লাগে ?—লুকিয়ে সোনা জিততে। ঘরের মধ্যে ঝোলানো ছাল ওঠা একটা লাল ট্র্যাকশ্যুট দেখিয়ে বলল এটা পরে ডেকানে সোনা জিতে বসে আছি। অন্য সবার পরনে দামী ট্র্যাকশ্যুট, এক গাদা মেয়ে এসে অন্য সবার মেডেল দেখছে এবং দোস্তি বানাতে আলাপ জমিয়েছে। অ্যানজেল মেরি এসে ওর এক নাইলন শ্যুট পরা বন্ধুকে জিগেস করছে 'হু ইজ ফার্স্ট'। ভদ্রলোক আমাকে দেখিয়ে বলল 'ঐটা'। আমায় দেখে সবার মুখ বেঁকে গেল। আমার খুব ভাল লেগেছিল, কেননা আমি সোনা নিলাম কেউই দেখেনি। এইটা পরেই নাশনালে যাবো, ছেঁড়া না থাকলেও ছিঁড়ে তাপ্পি লাগাবো লাল, সবুজ, হলুদ। সেজন্য, প্রস্তুত হচ্ছি।

ওর বাবা শঙ্কর আচার্য শুকল ভিলাইতে আট বছর আছেন। তিন ভাই, তিন বোন। ছোট ভাই জয়দীপ ১৯৭৮-এ ভূপাল থেকে বডি বিল্ডিং-এ সোনা জেতে। ওর অতীত দিন খুবই করুণ। গরীবদের ও ভগবান মনে করে এবং ভালবাসে।

বহরমপুরে স্বল্প দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা সন্তরণ সংস্থা ও মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল ক্রীড়া সংস্থার যৌথ পরিচালনায় ৭ এবং ৮ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের জলাশয়ে প্রথম বার্ষিক জেলা সন্তরণ প্রতিযোগিতা এবং জেলা স্কুল সন্তরণ প্রতি-যোগিতা হল।

জেলার বিভিন্ন সন্তরণ সংস্থা থেকে ৮০ জন এবং জেলা স্কুল সন্তরণ প্রতিযোগি-তায় জেলার ২০টি স্কুলের ৬০ জন প্রতিযোগী ১০০ মিঃ, ২০০ মিঃ, ৪০০ মিঃ এবং ১৫০০ মিঃ ফ্রি স্টাইল, ১০০ মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক, ১০০ মিঃ ব্যাকস্ট্রোক, ১০০ মিঃ বাটারফ্লাই ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিযোগিদের মধ্যে নিরঞ্জন দেবনাথ, পুলক চ্যাটার্জি, রামপ্রসাদ আগরওয়ালা, সঞ্জীব সরকার, পীর মহম্মদ, সিপ্রা দত্ত, অর্চনা রায়, অনিতা ঘোষ, বাসন্তী মণ্ডল, নিয়তি ভট্টাচার্য বিভিন্ন ইভেন্টে সফল হয়েছে।

যোহাননের প্রতি হাসপাতালের অবহেলার রিপোর্ট আজও প্রকাশ করা হল না কেন ?

অমল ত্রিবেদী : টি সি যোহানন। পুরোনাম থাডথুভিলা যোহানন। জন্ম উনিশে মে, ১৯৪৭। কেরালার অজ পাড়াগাঁ ইরামপানানগাড়ুতে। স্কুল জীবন থেকে লং জাম্পে ঝোঁক। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ভিলাই টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার-এর ডিপ্লোমা পেলেন। জামসেদপুর এলেন ১৯৭০ সালে। টাটা এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড লোকোমোটিভ কোম্পানির আমন্ত্রণে চাকরির জীবনে প্রবেশ। তারপর টি সি-র জীবনে আসতে শুরু করল একের পর এক সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিন।

কেরালার গণ্ডগ্রামের কালো মানিকটি পরিচিত হলো 'এশিয়ার বব বিমোন' নামে। সাংবাদিকরা উচ্ছসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। '৭৪ সাল যোহাননের জীবনের সেরা বছর। এ বছর তার অসামান্য ক্রীড়াকৃতির জন্য টি সি 'অর্জুন' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। তেহরাণ এশিয়ান গেমসে তার করা রেকর্ড আজো কেউ ভাঙতে পারেননি। ৭৪-এ তিনি লং জাম্পে ৮'০৭ মিটার লাফিয়েছিলেন! এটি যোহাননের জাতীয় রেকর্ডও বটে। (গত ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে সুরেশবাবু ৭'৮৫ মিটার লাফিয়ে সোনা পেয়েছেন)। '৭৫-এ তিনি ভারতীয় অ্যাথলেটিক দলের পক্ষে পাঁচটি আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স-এ অংশ নিয়ে প্রতিটিতে সোনা কুড়িয়েছেন। টোকিও, হিরোসিমা, কোবে, ফিলিপাইন ও শিবু-তে এই আসরগুলি বসেছিল। টোকিওর আসরে যোহানন এশিয়ার সেরা জাম্পার নির্বাচিত হন। টোকিও আমন্ত্রণী অ্যাথলেটিক্স-এ ভারত থেকে কেবলমাত্র যোহানন ও শিবনাথ সিং আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। ১৯৭৮-এর ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমস কমিটি যোহাননকে তার পূর্ব রেকর্ডের কথা মনে রেখে একটি সুন্দর কারুকার্যময় শিল্ড উপহার দিয়েছেন। বাহাদুর সিং এই শিল্ড বয়ে এনেছেন যোহাননের কাছে।

যোহানন এখন কোথায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন ? এখন তিনি থাকেন ইস্পাতনগরী জামসেদপুরের টেলকো কলোনীর এক কোয়ার্টারে। টেলকো'র জুনিয়র পি আর ও। সকাল ৮ টায় অফিস যান নিজের স্কুটারে। ফেরেন বিকাল ৪টায়। বিকালে কোন কোন দিন মাঠে যান। কোনদিন বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন। ঘরে একা থাকলেই মনে পড়ে যায় সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা। সেদিনের কথা যোহনন ভুলতে চাইলেও তা পারেন না। ১৯৭৮ সালের ১ জুলাই তার আনন্দঘন জীবনে এক অভিশাপ বয়ে এনেছে। এখনো চোখ বন্ধ করলে তিনি ভয়ে শিউরে ওঠেন।

পাতিয়ালায়ার ট্রেনিং ক্যাম্পে সেদিন প্র্যাকটিস করেছিলেন যোহানন।

ক'দিন পর এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দল গঠনের ট্রায়াল। প্র্যাকটিস করার সময় হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তাকে রাজেন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি করা হল। তার বাঁ হাঁটু থেকে রক্ত পড়ছিল এবং উরুর দুটি লিগামেন্ট জখম হয়েছিল। প্রথমে সবাই ভেবেছিল আঘাত তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু রাজেন্দ্র হাসপাতালে যোহাননের চিকিৎসার জন্য তখন কোন ডাক্তারকে পাওয়া যায়নি। দারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও অনেকক্ষণ তাকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়েছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হল। যোহানন এখন আর হাঁটু ভাঁজ করতে পারেন না।

পাঞ্জাব সরকার রাজেন্দ্র হাসপাতালে যোহাননের চিকিৎসার প্রতি অবহেলার অভিযোগ পেয়ে ওই হাসপাতাল সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দিলেন ৪ জুলাই। সরকার পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল—এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট আমরা জনসাধারণকে জানাতে চাই।

তারপর কত সপ্তাহ কেটে গেছে। বছর ঘুরে গেলেও আজো ওই তদন্তের রিপোর্ট বেরোয়নি। জনসাধারণ জানতে পারেনি ওই অবহেলার জন্য দায়ী কে ? যোহানন জানালেন—তদন্ত সেই কোন-কালে শেষ হয়েছে। কিন্তু সরকার জেনে শুনে রিপোর্ট চেপে রেখেছেন।

আজো যোহাননের চিকিৎসা চলছে। তিনি জানেন—আর কখনো আগের মত মাঠে নামতে পারবেন না। এখনো মাঝে মধ্যে পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন। কেরালার মালাপুরম-এর বিখ্যাত আর্য বৈদ্যশালার চিকিৎসাধীনে তিনি রয়েছেন। সেকেণ্ড কোর্স শেষে হয়েছে। থার্ড কোর্সে রয়েছেন এখন। নভেম্বরে আবার মালাপুরম যাবেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে। তার ডাক্তার এস ভ্যারিয়ারের আশা যোহানন অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

পাটনায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিনামূল্যে যোহাননের চিকিৎসা করাতে আমেরিকা নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আর্য বৈদ্যশালা পাকা কথা দেওয়ায় যোহানন তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। কয়েকদিন আগে তিনি কেরালার এক আকুপাংচার ডাক্তারের চিঠি পেয়েছেন। ওই ডাক্তার নিখরচায় যোহাননকে আকুপাংচার চিকিৎসার সাহায্যে সারিয়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যোহানন এব্যাপারে এখনও মনস্থির করেননি।

স্ত্রী, এক পুত্র ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে টি সি যোহাননের সুখের সংসার। বাড়িতে একা একা থাকলেই তার মনে পড়ে যায় সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিন-গুলোর কথা : আলমারি ভর্তি দেশ বিদেশের নানান ট্রফি ও গাদাগাদা সোনা-রুপোর মেডেলগুলো যোহাননকে তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়। তখন তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। নিজের অজান্তে কখন যে তার বুক ভেসে যায় সে খেয়ালই থাকে না টি সি যোহানন; এশিয়ান বব বিমোনের। ●



আলমারি ভর্তি দেশ বিদেশের নানান ট্রফি ও গাদাগাদা সোনা-রুপোর মেডেলগুলো যোহাননকে তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়।

অ্যাথলেটিক্সের ইভেণ্ট রোজারিও অ্যানটাওকে ফুটবলে দারুণ সাহায্য করছে

চিন্ময় বিশ্বাস ঃ গত মার্চের ২১ তারিখের সংবাদপত্র খুলে বাংলার ফুটবল প্রেমিকরা আঁতকে উঠেছিলেন একটি অভাবিত সংবাদ দেখে। 'রোভার্স কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে ওরকে মিলসের কাছে মোহবাগানের ৪-০ গোলে শোচনীয় পরাজয়'। এর মধ্যে অ্যানটাও নামে এক যুবকের একটি অনবদ্য হ্যাটট্রিকও ছিল। স্মরণাতীতকালের মধ্যে মোহনবাগানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক শেষ কবে হয়েছে অনেকেরই মনে নেই। এরকম তারকা-খচিত, ডাকসাইটে দলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করা যে কোন ফুটবলারের স্বপ্ন এবং গর্বের বস্তু। কিন্তু যিনি এই দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী। সেই অ্যানটাও কিন্তু নির্বিকার চিত্তে আরও বড় হওয়ার সাধনায় নিমগ্ন।

পুরোনাম রোজারিও অ্যানটাও। পুনের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ১৯৫৫ সালে। বাবা ভাল ফুটবলার ছিলেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে অ্যানটাও মেজ। তিন ভাইই ভাল অ্যাথলিট। বড় ভাই মোটর মেকানিক হিসাবে কুয়েতের বাসিন্দা। তবুও অ্যাথলেটিক্সের সংশ্রব একেবারে ছাড়তে পারেননি। ছোট ভাই অল ইণ্ডিয়া রেভিনিউ স্পোর্টসে ৫০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে চাম্পিয়ন। অ্যানটাও যখন পুনের অরনেলা স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই তিনি ভাল অ্যাথলিট। পরে ওর প্রথম চাকরিক্ষেত্র বাকাও উলক্ষের পক্ষ নিয়ে পুনেতে অনুষ্ঠিত আন্তঃশিল্প অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৮০০ মিটার দৌড়ে ১ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড সময় করে যে রেকর্ড করেন তা আজও অম্লান। এছাড়া ১৫০০ মিটার দৌড়ে, ৪০০ মিটার হার্ডলস, হপস্টেপ অ্যাণ্ড জাম্প এবং জ্যাভেলিন ছোঁড়ায় প্রথম হয়ে দলকে চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার পথ সুগম করে দেন। এছাড়া মহারাষ্ট্রের হয়ে একবার আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিক্সেও অংশগ্রহণ করেন।

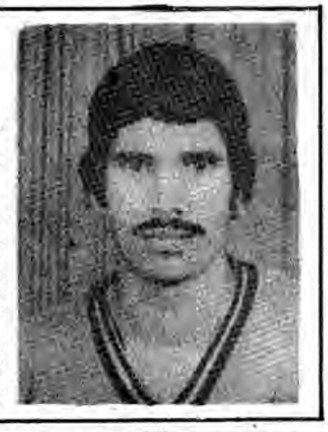
জাতীয় প্রতিযোগিতায় এ পর্যন্ত সবচেয়ে অধিকবার অংশগ্রহণ করেছেন হ্যাণ্ডবলের মাধ্যমে। মোট চারবার অংশ নিয়েছেন মহারাষ্ট্রের পক্ষে। তার মধ্যে অধিনায়কও হয়েছেন একবার। ১৯৭৭ সালে কুয়েত সফরের জন্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হন। কিন্তু সফর সেবার বাতিল হয়ে যায়।

১৯৬১ সালে অ্যানটাও মহারাষ্ট্র স্কুল দলের হয়ে অটুম স্কুল গেমস থেকে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা শুরু করলেও ফুটবলকে সিরিয়াসলি নেন মাত্র বছর তিনেক আগে। ফুটবলে ওর প্রথম ক্লাব ফাতিমা এফ সি, তারপর পুনে একাদশের হয়ে একনাগাড়ে তিন বছর খেলেছেন। '৭৮-এ বম্বের ওরকে মিলস থেকে ডাক আসে এবং তাতে সাগ্রহে সাড়া দেন। অ্যানটাওকে বম্বেতে আনেন ওরকের লেফট উইংগার অমরজিত সিং। বম্বেতে ফুটবল খেলার প্রবল ইচ্ছা অ্যানটাওর থাকলেও মা কিন্তু এর তীব্র বিরোধিতা করতেন। কারণ ফুটবল খেলে ছেলে চোট্ বা আঘাত পাক সেটা তিনি চাইতেন না। অ্যাথলেটিক্সের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিলেও, ফুটবল সম্পর্কে তিনি ততটা উদার হতেন না। তবে বম্বেতে এসে খেলার অনেক উন্নতি হয়েছে। গতবার হারউড লিগে ২০টা খেলায় ১৭টা গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেয়েছেন।

ফুটবলার হিসাবে সবেচেয়ে বেশী ভাল লাগে সুরজিত সেনগুপ্ত এবং নিকোলাস পেরেরাকে। আর টিম হিসাবে ফতিমা এফ সি। ফুটবলে প্রথম ক্লাব বলে নয়—ওই ক্লাবের আন্তরিকতা এবং উৎসাহ ওর ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে। কোচ হিসাবে সবচেয়ে ভাল লাগে পুনের জাফর শেখকে। অ্যানটাওরের খুব ইচ্ছা ছিল সন্তোষ ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার। ওরকেতে যোগ দেওয়ার চার মাসের মধ্যে সে সুযোগ পান, গতবারের শ্রীনগর ন্যাশনালে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে যাত্রায় স্ট্যাণ্ড বাই থাকতে হয়।

ফতিমা এফ সি, পুনে একাদশ, সব দলেই লিংকম্যান পজিশনে খেলতেন। কারণ উনি বেশী জায়গা নিয়ে খেলতেঅভ্যস্ত এবং গোলও মন্দ পেতেন না ওই পজিশনে খেলে। কিন্তু ওরকেতে যোগ দেওয়ার পর কোচ শ্রীনিবাস সেলিয়ান অ্যানটাওকে স্ট্রাইকারে নিয়ে আসেন। এবং গোলের সংখ্যাও ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যায়। ওর প্রথম জীবনের অ্যাথলেটিক্স পরে ফুটবল জীবনে দারুণভাবে কাজে লাগে।

অ্যানটাওকে ওর আপাততঃ ফুটবল জীবনের সেরা খেলা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বলেন, 'গত মার্চে রোভার্স কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল আমার সেরা খেলা। খেলাটি ছিল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। তারকা-খচিত ডাকসাইটে এরকম একটা দলের বিরুদ্ধে ঠিক এরকম ফল হবে—আমাদের অতি বড়



ওই রোজারিও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রোভার্স কাপে হ্যাটট্রিক করেছিল

সমর্থকও আশা করেননি। কারণ তার আগের দুটি খেলায় নিতান্ত মামুলিভাবে জিতে ছিলাম। মোহনবাগান ম্যাচের আগের দিন শুধু ঈশ্বরকে ডেকেছি। শুধু একটা গোল যেন অন্ততঃ আমি পাই। কারণ আমি জানতাম মোহনবাগানের শুধু গোলকিপার বাদে আর প্রায় সবাই কোন না কোন সময় জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাই আমরা শুরু থেকে ঝড়ের মত আক্রমণ শুরু করি। এবং শুরুতেই আমরা গোল পেতে পারতাম। বার্নাড পেরেরার ফ্রি-কিক থেকে আমি হেড করে গনেশ রাওকে বল দিই। কিন্তু রাও গোলের কাছ থেকে বলটা কাজে লাগাতে পারেনি। একটু পরেই আমার আর একটি হেড মোহন-বাগানের কোন এক ডিফেণ্ডারের পায়ে লেগে ফিরে আস। অ্যানড্রুর কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ থেকে সেণ্টার করা একটি বলে ছুটে গিয়ে হেড দিয়ে আমি প্রথম গোল পাই। তারপরেই মোহনবাগানের একটি কাউণ্টার অ্যাটকে আমাদের ডিফেণ্ডার ড্যামিনিক র‍্যামশ ব্যর্থ করে দেয়। প্রথম গোলটা দেওয়ার পরে আমার মনে বিশ্বাস জন্মাল এবং জেদ চেপে গেল যে আরও গোল পাব। প্রথমার্ধে আমরা ওই ১—০ গোলেই এগিয়ে থাকি। দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের ফরোয়ার্ডরা বিশেষ করে বার্নাড এবং অমরজিত দুর্দান্ত খেলতে থাকে। প্রেমরাজের ফ্রি-কিক প্রদীপ চৌধুরী ভুল হেড করে আমার কাছে পাঠান মাত্র আমি ওই বল গোলে পাঠাই। তৃতীয় গোলও প্রায় একই ভাবে করি। শেষ গোলটি অমরজিত সিং-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। খেলার শেষ বাঁশী বাজার পর গ্যালারি থেকে শুধু অভিনন্দন, আমার মনে হল যেন স্বপ্নের জগতে আছি।'

অ্যানটাওয়ের অবসর সময় কাটে হ্যাণ্ড বল খেলে, আর বাচ্চাদের কোচিং করে। তবে অ্যানটাও বর্তমানে কোমরের আঘাতে চিন্তিত। উঠতি ফুটবলার হিসাবে উনি এখন সম্ভাবনার কুঁড়ি। আশা করা যায় তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে মাঠ কাঁপাতে আবার ফিরে আসবেন।

অ্যালবাম



ভারতের অধিনায়িকা মণ্ডপন শুভেচ্ছা বিনিময় করছে সোভিয়েত রাশিয়ার এন কাজিকোভার সঙ্গে

মস্কোর বিশ্ব-হকির আসরে বিশেষ-পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় মেয়েরা, ট্রফি হাতে অধিনায়িকা আর মণ্ডপন



লিবারেটাডোরস কাপ জিতল পারাগুয়ের ওলিম্পিয়া ক্লাব

দক্ষিণ আমেরিকার সেরা ক্লাবগুলোকে নিয়ে লিবারেটাডোরস কাপের প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর। এবার হল বিশতম প্রতিযোগিতা। এর আগের ১৯ বারের প্রতিযোগিতায় তিনটি দেশের আটটি ক্লাব ঘুরে ফিরে জয়ী হয়েছে। এবারের বিজয়ী পারাগুয়ের ওলিম্পিয়া ক্লাব—বিজয়ীর তালিকায় এই দেশ ও ক্লাব দুটোই নতুন নাম। ওলিম্পিয়া হারিয়েছে গত বছরের বিজয়ী আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র দলকে প্রথম লেগের খেলায় ২-০ গোলে। দ্বিতীয় লেগের খেলা গোলশূন্য ভাবে শেষ হয়। খেলা দুটি হয়েছিল যথাক্রমে আসানসিয়ন ও বুয়েনস আইরেস-এ।

এর আগের ১৯ বারের মধ্যে কাপ পেয়েছে আর্জেন্টিনা ১২ বার, উরুগুয়ে ৪ বার আর ব্রাজিল ৩ বার। এক সময় তাই লোক মুখে কাপটির নাম হয়ে যায় আর্জেন্টাইন কাপ।

ওলিম্পিয়া এই প্রথমবার জিতলেও, এর আগে ১৩ বার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে ফাইনালে উঠেছিল মাত্র একবার, ১৯৬০ সালে যে প্রথম প্রতিযোগিতা হয়, সেবার।

ওলিম্পিয়া যে দল নিয়ে পারাগুয়ের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগ জিতেছিল গতবার, লিবারেটাডোরস কাপে সেই দলের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। শুধু কোচ হিসাবে আনা হয়েছিল উরুগুয়ের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় উইংগার সুইস কুবিলাসকে। কুবিলাসকে আনার কারণ তার এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রচুর।

কুবিলাস কোচ হিসাবে প্রবীণ নয়, অভিজ্ঞতা মাত্র তিন বছরের, আর তা দিয়েই পারাগুয়ের ফুটবল জগতে একেবারে দারুণ এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। কুবিলাস ওলিম্পিয়া দলকে নিয়ে মরশুম শুরু হওয়ার আগেই এক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেটা পারাগুয়েতে অভিনব ব্যাপার। আর দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে যখন কোন অদল বদল করা সম্ভব নয়, তখন তিনি যারা আছেন, তাদের নিয়ে ঘষামাজা করে কাজ শুরু করলেন। রক্ষণভাগে ফ্ল্যামিনো সোসা, লুইস টোরেস, হিউগো টালাভেরা; আক্রমণভাগে এভারিস্টো ইসাসি, এ্যালবার্টো কিয়েস, এ্যাটানাসিও ভিল্লালবার খেলা দেখে মনে হল তাদের ওপর আস্থা রাখা যায়। কুবিলাসের ধারণা হল একজন এমন দরের খেলোয়াড়, যারা নিজ প্রতিভায় বিশ্বের যে কোন সেরা দলে জায়গা পেতে পারে, কিন্তু এতদিন সেই প্রতিভার আগুন ছাই ছাপা পড়েছিল।

কুবিলাস আর একটা কাজ করেছিলেন, যেটা পারাগুয়ের খেলোয়াড়দের কাছে একেবারে নতুন—দিনে দুবার প্র্যাকটিস। মুশকিল ছিল তাতে, অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই ফুটবল খেলাটা জীবিকা নয়, অন্যান্য কাজে সময় ব্যয় করতে হয়। যেমন অধিনায়ক টালাভেরা একজন আর্কিটেক্ট। তবু তারা যাহোক করে সময় করে নিয়েছিলেন।

এত পরিশ্রমের সুফল পাওয়া গেল অচিরেই। ওলিম্পিয়া এর আগে একমাত্র ফাইনালে উঠে যে দলের কাছে হেরেছিল, উরুগুয়ের সেই সেরা দল পেনারোলকে হারাল মন্টিভিডিওর এক গ্রীষ্মকালীন টুর্নামেন্টে। হারাল উরুগুয়েরই আরেক বিখ্যাত দল ন্যাশনালকে। এবার লিবারেটাডোরস কাপে ওলিম্পিয়া মোট ১২টি খেলেছে তার মধ্যে জয় ৯টি, ড্র ২টি, আর পরাজয় মাত্র একটি খেলায়। লা পাজ-এ বলিভিয়ার সেরা দল বলিভারের কাছে ওলিম্পিয়া হারল ১—২ গোলে। ওলিম্পিয়া দলে সে খেলায় অনুপস্থিত ছিল চারজন স্টার খেলোয়াড়। এর আগেই বলিভিয়ারই আরেক দলের সঙ্গে খেলায় ক্রুদ্ধ দর্শক মাঠে ঢুকে ওলিম্পিয়ার খেলোয়াড়দের আক্রমণ করায় তারা চারজন আহত হয়েছিল।

বলিভারের সঙ্গে হেরে যাওয়ায় ওলিম্পিয়া সেমিফাইনালে খেলতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। শোনা যায় পারাগুয়ের আরেক দল সোল ডি আমেরিকা (যাদের সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা আর ছিল না) ওলিম্পিয়ার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্রস্তাব পেয়েছিল, যদি তারা বলিভারের সঙ্গে খেলায় ড্র করতে পারে। সোল ডি আমেরিকা ও বলিভারের খেলা ২—২ গোলে শেষ হয় এবং ওলিম্পিয়া সেমিফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনাল লিগে তাদের একমাত্র ব্রাজিলের গুয়ারানি দল ছাড়া আর কোন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয়নি।

ফাইনালে প্রথম লেগের খেলায় প্রথম তিন মিনিটেই ওলিম্পিয়া এগিয়ে যায়, বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের ভুলকে কাজে লাগিয়ে অ্যাকুইনো ফাঁকা গোলে বল পাঠায়। দ্বিতীয় গোলটি হয় পিয়াজ্জার ফ্রি-কিক থেকে। বলটা মাটিতে ড্রপ খেয়ে গোলরক্ষক গাত্তিকে ফাঁকি দিয়ে গোলে ঢুকে যায়। দুটি গোল খুবই সাধারণ, এছাড়া সারাক্ষণের খেলায় ফুটবল যত না ছিল তার চেয়ে দৌড়ঝাঁপ, অহেতুক বল মারামারিই বেশী হয়েছে। দ্বিতীয় লেগের খেলাটিও টেনশনে ভরা বাজে ফুটবলের উদাহরণ। দু'দলের একাধিক খেলোয়াড়কে মাঠ ছাড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ওলিম্পিয়া জেতার জন্য খেলেওনি। প্রথম লেগের দু'গোলের ব্যবধানটা যাতে আর না কমে, সেজন্য গোলমুখে তাদের প্রায় এগারো জন খেলোয়াড়ই কড়া পাহারায় থেকেছে। আর অভিযোগ উঠেছে খেলা যে পরিচালনা করেছে, উরুগুয়ের কার্ডেলিনোর বিরুদ্ধে, সে নাকি টাকা খেয়ে বোকা জুনিয়রকে ম্যাচ জিততে দেয়নি।

লিবারেটাডোরস কাপ বিজয়ী পারাগুয়ের ওলিম্পিয়া ক্লাব





কি করে ফুটবলার হওয়া যায়

স্বরাজ ঘোষ ঃ ফুটবল হল পায়ে বল। কিন্তু ফুটবল খেলার সময় হ্যাণ্ডবলেরও প্রয়োজন হয়। সেটা কখন? গোলকিপারদের গোলরক্ষা করার সময়ই বেশী কাজে লাগে। আর অন্যান্য পজিসনের খেলোয়াড়দের বল 'থ্রো ইন' করার সময়, গোলকিপারদের বল গ্রিপিং, হোল্ডিং, পাঞ্চিং ও লিফটিং-এর ব্যাপারে দক্ষ হওয়ার জন্য কতই না সাধনা করতে হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বল 'থ্রোইং'-এর ব্যাপারে খেলোয়াড়রা গুরুত্ব কম দেয়। যদিওবা গোলকিপার বল 'থ্রো' করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় ও অনুশীলন করে। কিন্তু অন্যান্য পজিসনের খেলোয়াড়রা 'থ্রো ইন'-এর মূল্যবোধ না বুঝে 'থ্রো ইন'-এর সঠিক অনুশীলন কম করে। এর প্রধান কারণ, খেলার সময় 'থ্রো-ইন' এর ফুটবল আইন অনুযায়ী কতকগুলো সুবিধা দেওয়া আছে, সেগুলো না জানার জন্য। আরেকটি মস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সেটা—হাতের জোর বা অনুশীলন অভাবে লং অর্থাৎ দূরে থ্রো করার অক্ষমতা। এবার সুযোগগুলো কি তা সংক্ষেপে লিখছি। কারণ আমি যখন খেলা পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্লেষণ করব তখন আরও সরল ও সবিস্তারে বর্ণনা করব। 'থ্রো ইন'-এর ব্যাপারে প্রথম সুযোগ দেওয়া আছে, এই সময় কোন খেলোয়াড় অফসাইড পজিসনে থাকলে অফসাইড হবে না। 'থ্রো ইন' থেকে সরাসরি গোল হবে না। বলকে স্পর্শ করতেই হবে। কাজেই 'থ্রো ইন' থেকে অফসাইড পজিসনে সুট বা হেড করলে গোল হবে। আরেকটা সুযোগ হল—'থ্রো ইন'-কে বলে 'ফেস অব গেম' অর্থাৎ খেলার মুখ বা উৎস স্থান। অনেক সময় সেই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অনেক খেলোয়াড় চালাকি করে 'থ্রো ইন' করে নেয়। যেমন, সেণ্টার বা সুট করার ভান করে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের গায়ে বল মেরে 'থ্রো ইন' করে নেয়। এমন কি কর্নারেরও সুযোগ করে নেয়। আর যে খেলোয়াড় 'থ্রো ইন' করবে সে সম্পূর্ণ মাঠ ও নিজের খেলোয়াড়দের দেখবার সুযোগ পাচ্ছে ও পুনরায় সংগঠন হওয়ার সুযোগ করে নিচ্ছে। তেমনই গোলকিপারের ব্যাপারেও 'ফেস অফ দ্য গেম' কথাটি সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে। যখন খেলা চলতে থাকে কোন খেলোয়াড় গোলকিপারকে ব্যাক পাস করলে দর্শকগণ অজ্ঞানবশত নানারকম মন্তব্য বা ব্যঙ্গোক্তি করতে থাকে। তারা জানেন না যে ওই ধরনের ব্যাক পাসের অর্থ কি, কোন উদ্দেশ্যে গোলকিপারকে ব্যাক পাস দেওয়া হয়ে থাকে। এবার জেনে রাখ যে গোলকিপারই হোল খেলোয়াড়-সংসারের মধ্যমণি। তার কাজ খেলাকে সবচেয়ে বেশী বোঝা ও প্রতি আক্রমণের সময় নির্ভুল বিচার করে প্রতিআক্রমণের উদ্দেশ্যে বলকে খেলোয়াড় বা নির্দিষ্ট স্থানে থ্রো বা কিক করে পাঠান। এক একটি প্রতিআক্রমণে বিপক্ষ দলের বিপর্যয় নেমে আসে। আবার খেলার সময় খেলোয়াড়রা বেসামাল বা ভুল বোঝাবুঝির ফলে দিশেহারা হয়ে যায়। তখন আবার সুসংবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে বলকে গোলকিপারের কাছে ব্যাক পাস দেয়। কারণ বলকে নিজেদের কাছ থেকে হাতছাড়া করে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের কবলে বল তুলে দেয় না। অনেক সময় আবার এমন অবস্থা হয় যে আক্রমণ হানবার উদ্দেশ্যে বলকে গোলমুখে বাড়ানো কোন কার্যকরী ফল অথবা গোল হবার সম্ভাবনা নেই ভেবে। আবার খেলাটাকে উদ্দেশ্যমূলক করার জন্য বলকে একেবারে ব্যাক পাস করে গোলকিপারের হাতে তুলে দিতে হয়। কাজেই একজন গোলকিপারকে 'টোটাল ফুটবলার' বলা হয়। কারণ তার সর্ববিভাগের খেলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

একজন আদর্শ গোলকিপার হতে হলে অ্যাথলেটিক্স ফিটনেসের প্রয়োজনে স্প্রিণ্টার, হাই, লং, হপ-স্টেপ এ্যাণ্ড জ্যাম্প, পোলভল্ট,



জ্যাভেলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রো ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কাজেই এই সমস্ত গুণের অধিকারী হলে গোলকিপার নিশ্চয়ই সুস্বাস্থ্য ও সুদেহী হবে।

আমি আমার প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লিখেছিলাম, বর্তমানে যারা দুর্বল ও যাদের দৌড়ঝাপ করে খেলার ক্ষমতা নেই তারাই গোলকিপার পজিসন বেছে নেয়। আর আমার নজরে আসছে, তাদের গোল লাইনে দাঁড়িয়ে শুধু হোল্ডিং, গ্রিপিং ও মাঝে মাঝে ডাইভ ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। এতে নিশ্চয়ই বোঝায় না যে যারা সবল বা যাদের তাৎক্ষণিক অ্যাটিং, রিকভারিং, ড্যাস, পাঞ্চ, ফিস্ট ইত্যাদি আছে তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। শিক্ষার দুটি দিক থাকে। প্রথমটা ত্রুটিগুলি ধরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়টি হল তার সংশোধন ও সংযোজন। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে চোখে আঙুল দিয়ে ভবিষ্যতে দেখাবার ব্যবস্থা নেই, সেখানেই উদাহরণ বা উপমা অর্থাৎ ইতিহাস তুলে ধরতে হয়। এটাই হল নিয়ম সম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষাদান। তা না হলে শিক্ষার্থীরা বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস নয়নে কাজ করবে না।

আমি লিখছি তাদেরই উদ্দেশ্যে—যারা প্রথম জীবন থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেলা শিখতে চায়। যারা জেনে গেছে বা আমার লেখা মত যাদের গ্রহণ করার ইচ্ছা নেই তাদের জন্য নয়। অনেক কথা, অনেক প্রশ্ন আমার কানে আসে, তাই বলে ত' নিয়ম ও সত্যের পথ থেকে সরে যাওয়াটা ঠিক নয়। কারণ আমি বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু সফল অভিজ্ঞতায় ও বিশ্বের সেরা দুই ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত কোচিং পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছি। আর কখন এই লেখা ধরেছি? যখন জাতীয় ফুটবলের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে।

এই সংখ্যায় ডিসকাস থ্রো-এর একটা ছবি দেওয়া হল। ছবি দেখে নিশ্চয়ই মনে হবে যে গোলকিপার বল ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর ছবির নায়কের চেহারাটা ভাল করে দেখবে। সাধনা করলে তোমরাও হতে পারবে।

(চলবে)

ইস্টবেঙ্গল কেন শিল্ড পেল না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগস্টের শেষ সপ্তাহে তখন আই এফ এ শিল্ডের ক্লাস্টার লিগের ম্যাচগুলি হচ্ছিল জেলায় জেলায়। সেই সময় দিন দশেকের মধ্যে পর পর দু'খানি জরুরী ব্যক্তিগত চিঠি পেয়েছিলাম ভিন রাজ্যের এমনই একজন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে, যিনি এদেশের বিভিন্ন বড় বড় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিশেষ যত্নবান থাকেন কখনো রেফারি বা কোচের ভূমিকায়। ভদ্রলোক দেশের হয়েও বহুবার বিদেশের মাটিতে দাপিয়েছেন নানা প্রতিযোগিতায়।

পাটনা-কলকাতা ও শ্রীনগর পর পর এই তিনবার জাতীয় ফুটবলের আসরেই ফুটবল সম্পর্কীয় যাবতীয় আলাপে তার সঙ্গে হৃদ্যতা গভীর হয়েছিল মূলত দু'টি কারণে ঐকমত্য হয়ে। এক ঃ গোটা ভারতের ফুটবল বলতে বাংলাকে ছাড়া ভাবাই যায় না। দুই ঃ বাঙালীরাই যথার্থ ফুটবলের সমঝদার।

ওই সময় ভদ্রলোক এও আঁচ দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে কলকাতার কোনো বড় ক্লাবে কোচিং-এর দায়িত্ব-ভার নেবার তার বড়ই আশা।

উনআশির আই এফ এ শিল্ডের একদম গোড়ার অবস্থাতেই তার কাছ থেকে নয় দিনে দু'টি চিঠি পেয়েছিলাম এই বক্তব্যে যে, তিনি এবার কলকাতায় আসতে আগ্রহী। প্রাইমারী এন্ট্রি হিসেবে একটি বিজ্ঞাপনের কাটিং পাঠিয়েছিলেন এবং মতামত চেয়েছিলেন। ওই বিজ্ঞাপনটি দেশের প্রায় সব ইংরাজি দৈনিকে ফলাও করে প্রচার হয়েছিল এইভাবে ঃ

FOOTBALL COACH

REQUIRED, BY A GROUP OF CALCUTTA-BASED COMPANIES, to select and train a team of young footballers for participation in national tournaments.

QUALIFICATIONS:

(a) Diploma from N.I.S., Patiala, with minimum five years experience as Coach in a reputed club.

(b) Preference will be given to those who have represented India in international tournaments.

AGE:

30-40 years (relaxable in exceptional cases).

EMOLUMENTS:

Upto Rs.. 2000|- per month (consolidated) depending on experience and ability. Perquisites as per Company rules.



পায়ারেসের মাথা থেকে বল তুলে নিচ্ছে ভাস্কর/ পাহাড়ী

এরপর তিনি কোনো বিশেষ কারণে কলকাতায় এলেন। আই এফ এ শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত সব খেলা দেখলেন এবং শুনলেন ইস্টবেঙ্গলের জটিল রাজনৈতিক আবর্তের কথা। বিশেষ করে কোচ অরুণ ঘোষকে অকেজো করে দেবার বিষয়টাতে তার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিবেক প্রচণ্ড ধিক্কারে মুখর হল আই এফ এ শিল্ডের ফাইনাল প্রতিযোগিতার দিন রাতে।

কলকাতায় কোচিং দায়িত্ব নিয়ে আসার পরিকল্পনা সব তিনি বরবাদ করে দিলেন। ভদ্রলোকের বর্তমান চাকুরি ইত্যাদি বিষয়ের জন্য নাম ধাম বললাম না।

দিল্লি উড়ে যাবার আগে টেলিফোনে তার শেষ কথা শুনেছিলাম '—শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের এতো করুণ অবস্থা হবে ভাবতেই পারিনি। শুনেছিলাম এবং ডুরাণ্ড বা রোভার্সে দেখেছিও দুই প্রধান মুখোমুখি হলে মোহনবাগান বরাবর কুঁকড়ে যায় লাল-হলুদ জামার সামনে। অথচ এবারে মোহনবাগান নাকাল করে ছাড়লো ইস্টবেঙ্গলকে পুরো নব্বুই মিনিটই অদ্ভুত ভাল ফুটবল খেলে।'

কেন এমন হল ? দু'বছর লিগ ও শিল্ডের লড়াই-এ মোহনবাগান সাফল্য পেল। ইস্টবেঙ্গল মরিয়া হয়ে এবারেও গোটা ভারতের প্রায় সব ফুটবল স্টার জড়ো করেও সাফল্য পেল না। কারা দায়ী ? হরজিন্দর, সাব্বির আলি বা দেবরাজরা বাজে প্লেয়ার বছর শেষে একথা এখন একজনও উচ্চারণে সাহস পাবেন না। লিগের ম্যাচে ড্র হলেও অধিকাংশ সময়টাতেই ইস্টবেঙ্গলের দাপট ছিল। কিন্তু শিল্ড ফাইনালে তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল প্রায় লিগের মাঝের দিকের দলগুলির শক্তির মত। বহু সুযোগ পেয়েও মোহনবাগান বেশি গোল পায়নি নিছকই মন্দ ভাগ্যের জন্য। পাওয়া সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারলে মোহনবাগান সেদিন অবশ্যই পাঁচ গোলের রেকর্ডটিকেও ম্লান করে দিতে পারতো।

আসলে ইস্টবেঙ্গল দলটির লিগ ম্যাচের গোড়াতেই গলদ ছিল বহু তারকা নিয়ে। কোচ অরুণ ঘোষকে ঘন ঘন বিব্রত হতে হয়েছে দলের প্রথম এগারজন ঠিক করার বিষয়ে। তার উপর দল গড়ার ব্যাপারে কর্মকর্তাদের বাজে খবরদারী ছিল মস্ত বাধা।

ক্লাবের দুরবস্থা সম্পর্কে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম সংবাদ ছাপা হল বাইরের তিন প্লেয়ার বনাম স্থানীয় প্লেয়ারদের সাপে-নেউলে সম্পর্কের

নানা কথা ফাঁস করে। তাতেই কিছু কর্মকর্তা আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ওই খবরটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কর্মকর্তারা জেদ ধরে বসলেন। তারা প্রাক্তন খেলোয়াড় পিটার থঙ্গরাজের উপর দলের সাময়িক দায়িত্বভার দিয়ে সদস্য সমর্থকদের মনকে চাঙ্গা করতে চাইলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয় কি করে? হরজিন্দর, মনজিতরা সারা লিগে দু'একটা ম্যাচে খেলে শিল্ড ফাইনালে বাজীমাত করবে—এমন উদ্ভট পরিকল্পনা ধোপে টিঁকলো না। এদিকে গতবছর এবং এবছরেও কোচ প্রদীপ ব্যানার্জির তদারকিতে মোহনবাগান ফৌজ একদম টগবগে হয়েছিল।

ফলে স্থানীয় প্লেয়ারদের ছাড়া তিন পাঞ্জাবী প্লেয়ার দিয়েই সাফল্য আসবে—এমন একগুয়েমীর ফল 'বুমেরাং' হয়ে দেখা দিল ফাইনাল খেলাটিতে।

কয়েকজন কর্তাব্যক্তির জেদের ফলেই গোটা ইস্টবেঙ্গল দলটিতে জাঁকিয়ে বসল এক নিশ্চিন্ত ভবিষ্যত এবং প্রচণ্ড নিষ্ক্রিয়তার ছায়া।

ফাইনালের আগের দিন কোচ থঙ্গরাজ বলেছিলেন, 'টিমের যা অবস্থা তাতে এখন কিছু আর করা সম্ভব নয়। প্লেয়াররা সবাই ভাল ফুটবল খেলে এবং বোঝে। নতুন করে শেখাবার তো প্রশ্নই নেই। এই ম্যাচিওর্ড প্লেয়ারদের জন্য প্রয়োজন লড়াই-এর মেজাজ তৈরি করা। কিন্তু দলের অনেকেই ভুগছিল নানা অস্থিরতায়। বিশেষ করে আগামীকাল কে কে খেলবে এই বিষয়টাতে। আমি নিজেও জানিনা কারা প্রথম এগারজন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। ক্লাবকে বরাবরই ভালবাসি এবং সেই টানেই দায়িত্ব ভার কাঁধে নিয়েছি। কিন্তু তেমন কিছু করার কি আছে খু'জে পাইনা। বিশ্রী একটা থমথমে অবস্থায় আছি।'

সেই সন্ধ্যায় সাব্বির এবং পরে আরো কয়েকজন ইস্টবেঙ্গল



খেলা শেষে ইস্টবেঙ্গলের পরেশ সাহা ও অন্য কয়েকজন/অরুণ মুখার্জি

খেলোয়াড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আগের বড় খেলার জন্য যেমন স্বাভাবিক টেনশনে থাকে সবাই, তেমন কোনো অবস্থার ছাপই খু'জে পাওয়া যায়নি কারো চোখে মুখে। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় সাব্বির সকালে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করেছিল। কিন্তু ও জানতো না পরদিন দলে ঠাঁই পাবে কিনা। ওর মত অনেকেই এই অবস্থায় ছিল। ফলে প্লেয়াররা মানসিকভাবে তৈরি হতে পারেনি।

অথচ সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল অনেক ভালো লড়াই দিয়েছিল। সদস্য-সমর্থকরা রঙীন স্বপ্নে বিভোর ছিলেন যে এইভাবে খেললে মোহনবাগানকে অতি সহজেই হারিয়ে শিল্ড আবার কেড়ে নেওয়া যাবে।

বোধকরি ওইসব মেজাজী কর্মকর্তারাও এই ধারণায় একাত্ম হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের আনা বাইরের প্লেয়ার খেলিয়ে সুযোগের ব্যবহারে তৈরি হলেন।

শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের হার কোন অগৌরবের নয়। সাতাশি বছরের শিল্ড ইতিহাসে দুই প্রবল প্রতিপক্ষেরই জয়-পরাজয়ের নানা ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে যা কখনো কীর্তি বা সময়ে বেদনার ছিল প্রচণ্ড ভাল লড়াই দিয়েও হেরে যাওয়ায়।

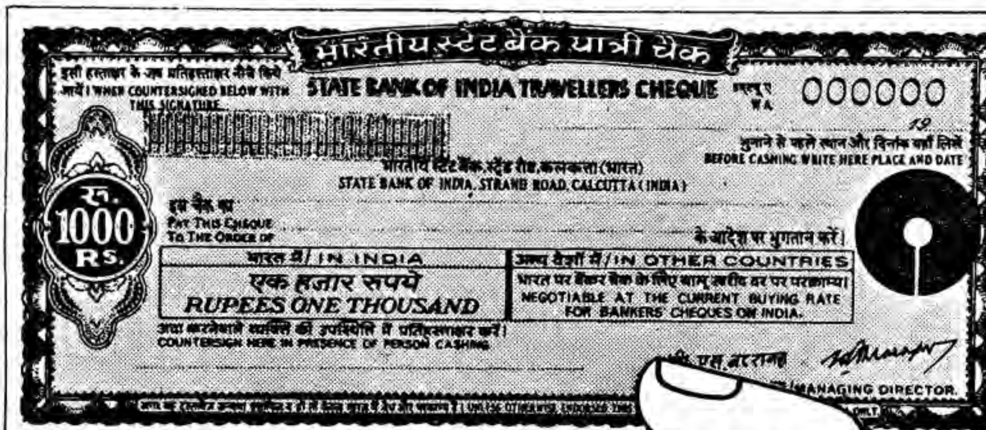
কিন্তু উনআশির শিল্ড ফাইনালের খেলাটায় মোহনবাগান যেভাবে বেসামাল অবস্থায় ফেলেছিল ইস্টবেঙ্গলকে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ইস্টবেঙ্গলের উনষাট বছরের গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্বের ভূমিকায় চরমতম গ্লানির আঁচড়।

গত দু'বছরে মোহনবাগান এক টানা জয় পেয়েছে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। পেলের দলকে রুখে দেবার পরেই তাদের জয়ের ক্ষুধা তীব্রতর হয় এবং একবার মাত্র ধাক্কা খেয়েছিল গত বছর ডুরাণ্ড ফাইনালে ০-৩ হেরে।

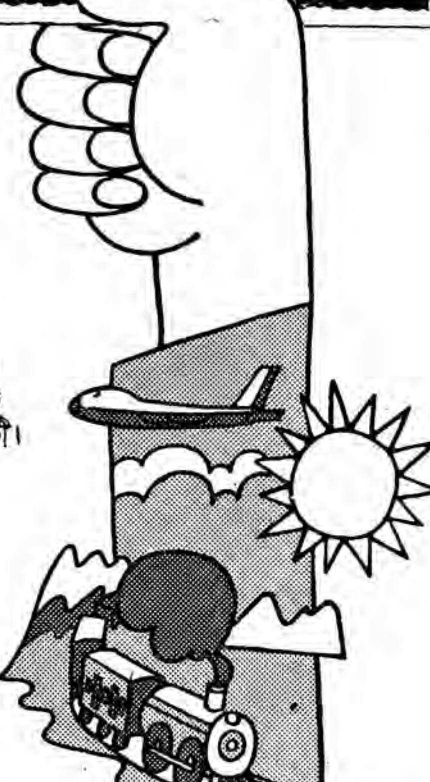




এখন এই ১০০০ টাকা চুরি যাবার সম্ভাবনাই নেই!



স্টেট ব্যাঙ্কের নতুন ১০০০/- টাকার ট্রাভেলার্স চেক!



- এছাড়াও ৫০/-, ১০০/- ও ৫০০/- টাকার নির্দিষ্ট সংখ্যায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার এবং তার সহযোগী ব্যাঙ্কের ৭৩০০' এরও বেশী অফিসে পাওয়া যায়।
- এটি ইস্যু এবং নগদ করার জন্য কোনো বাড়তি খরচা লাগে না।
- যদি এটি হারিয়ে বা চুরি যায় তাহলে যে অফিস এটি ইস্যু করেছে সেখান থেকে টাকা ফেরত পাবার জন্যে পাবেন মানি-ব্যাক গ্যারান্টী।
- নগদ করানো খুবই সহজ: এটি ভাঙ্গানোর সময় কোনো পরিচয় পত্রের দরকার লাগে না।
- এটি ভাঙ্গানোর জন্য কোনো সময়-সীমা নির্দিষ্ট করা নেই।
- সারা ভারতে ২৫,০০০ এর বেশী স্থানে (আউটলেটে) এটি নগদ করা যায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক ট্র্যাভেলার্স চেক

যে টাকা আপনার হারাবেও না, চুরিও যাবে না।

স্টেট ব্যাঙ্ক
আসুন, একসাথে এগোই!

সব মেট্রোপলিটান নগরীর ও শহরাঞ্চলের আমাদের শাখাগুলিতে রাজাজী জন্ম-শত-বর্ষ জয়ন্তীর কুপন পাবেন।

SB-4939 A

অন্যচোখে

ডুবুরী ঃ পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন ধনীদের মাপকাঠি বিচার হত ক্রীতদাস নিয়োগের ভিত্তিতে। যার যত বেশী ক্রীতদাস থাকত, ধনী সমাজে তিনি প্রধান বিবেচিত হতেন। সে যুগের ধনী সম্প্রদায় কখনও কখনও আবার জ'াকজমক সহকারে বিড়ালের বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইতেন তাদের পয়সায় ছাতা পড়ছে। কিশোর উপন্যাসে পড়েছি রবিনসন ক্রুশো জাহাজ ভরাডুবির কবলে পড়ে হঠাৎ একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে সেখানকার সম্রাট বনে গিয়েছিল। বাঁচার তাগিদে সে ভরাডুবি জাহাজ থেকে দিনের পর দিন সাঁতরে রসদ জোগাড় করে এনেছিল। দ্বীপের পশুপক্ষী, জানোয়ারদের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে পশুপালন শিখেছিল। গাছ-গাছড়া, ফল-মূল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে উদ্ভিদতত্ত্ব আয়ত্ত করেছিল। এমনকি দ্বীপের সম্রাট হয়েও নিঃসঙ্গ জীবন তার কাছে অভিশাপ মনে হয়েছিল। মানুষ যে সামাজিক জীব এবং সমাজ ছাড়া যে সে বাঁচতে পারে না—এটাই তাকে দিনের পর দিন পাগল করে তুলেছিল। তাই নরঘাতকদের হাত থেকে সে একজনকে বাঁচিয়ে তাকে তার সঙ্গী বা ক্রীতদাস করল। নাম ফ্রাইডে। আদিম অধিবাসী ফ্রাইডে না জানত ভাষা, না ছিল তার ভদ্রোচিত শিক্ষা-দীক্ষা। সুতরাং তাকে মানুষ করার চিন্তায় নতুন উদ্যমে ক্রুশো বেশ কিছু সময় কাটাল জনমানবশূন্য সেই দ্বীপে। কিন্তু তারও কিছুকাল পরে তারা দুজনেই হাঁপিয়ে উঠল। মানুষের সমাজে মেশার নেশা তাদের পাগল করে তুললো। দ্বীপের পাশ দিয়ে দূর-দিগন্তে জাহাজের মাস্তুল দেখলেই 'হেলপ-হেলপ' শব্দের ঝঙ্কার তুলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার তুলত, কিম্বা গগনভেদী শব্দের আওয়াজ তুলে নানান রকম নিশানা বা পতাকা নিয়ে দ্বীপের কূলে কূলে দৌড়ে জাহাজের দৃষ্টি আর্কষণের চেষ্টা করত। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর তারা ক্রমাগত ব্যাকুলভাবে চেষ্টা চালাতে চালাতে হঠাৎ একদিন সফল হল। অর্থাৎ কিনা তাদের কূলে জাহাজ এসে ভিড়ল। তারা মনুষ্য সমাজে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেল। মানুষের সঙ্গে মেশার টানটা এমনই প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সাম্রাজ্য ছেড়ে তারা মানুষের সমাজে ফিরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

কলকাতার সাঁতারের সমাজে নির্বাসিত জীবনের গ্লানি উপলব্ধি করে হাঁপিয়ে উঠেছে এমন একটি সংস্থা যার অবস্থা ঠিক রবিনসন ক্রুশোর মতন। তার সহচরী ফ্রাইডেকে নিয়ে বেশ কিছুকাল হেসে খেলে দিন কাটিয়েও সে সমাজের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। বাঁচার তাগিদে সে ক্রমাগত সমাজ বা গোষ্ঠী খুঁজে বেড়াচ্ছে। বছরে একবার জ'াকজমক সহকারে বিড়ালের বিয়ে দিয়েও সে যেন হালে



পানি পাচ্ছে না। কেবল হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর ব্যাকুল হয়ে বলছে ভেড়াও তোমার তরী আমার ঘাটে। সম্ভবত রবিনসন ক্রুশোর মতন একঘেঁয়েমি জীবন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লোভে সে আকুলি বিকুলি করে যাচ্ছে মুক্তির উপায় খুঁজতে।

নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে সে অনেক কিছু শিখেছে—অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে—অনেক কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে—কিন্তু ঘাটে তরী ভিড়ছে না। পাঁকাল মাছের মতন কেবলই পিছলে যাচ্ছে যাকেই আপন করার চেষ্টা করছে।

শুনেছি ক্রিকেট খেলার সময় পৃথিবীর কোন কোন দেশের সমর্থকরা ব্যাটধারীদের চোখে আয়না ফেলে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার ফিকির করে। সাঁতারের আঙিনায় আয়না নিয়ে ঘুরছে এমন একটা লোক যার উদ্দেশ্য প্রতিচ্ছবির রূপটা বিকৃত করা। অবশ্য আজকাল দেশী কাঁচে বিকৃত রূপটাই আগে ধরা পড়ে। আর সেই রূপটা আরও বিকৃত বা কুৎসিত হয়ে ফুটে উঠে যদি কাঁচটা একেবারে গোলা মিস্ত্রিরির তৈরি হয়।

বর্তমানে কলকাতার সাঁতারের আঙিনায় রাজ্য সাঁতার সংস্থার অবস্থা সেই জাহাজ ভরাডুবির মতন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা সভাপতির কাছে বর্তেছে। রবিনসন ক্রুশোর মতন ওই সংস্থা তিলে তিলে ভরাডুবি জাহাজ থেকে রসদ ও সম্ভার নিয়ে এসে কূলে ঘর বেঁধেছে। এখন দল ভাগাভাগির পালা চলছে। কাউকে রাজা বানিয়ে দেওয়া, কাউকে সিলেকশন পাইয়ে দেওয়া, আর নয়তো কাউকে ইণ্ডিয়ার ব্লেসার দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানার চেষ্টা চলছে। নাগতলা-বাঁশতলা, আমতলা-জামতলা নামক বিদঘুটে নানান মনগড়া সাঁতার সংঘের সংখ্যার সঙ্গে তাদের মিতালির সম্পর্ক আছে এই বার্তা রটিয়ে লোকচক্ষে প্রমাণ করতে চাইছে কলকাতার সাঁতার সমাজে তারা একা নয়, অনেকেই তাদের সঙ্গে আছে। কিন্তু কলকাতার সাঁতারু মহল ভোলেনি ভূপালের মত জাতীয় সাঁতারের অধিবেশনে আসাম ও ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা কারা? জাতীয় পর্যায়ে মিথ্যার উপর নির্ভর করে ওই ধাপ্পাবাজীর জোরে অন্যান্য রাজ্যের বা প্রতিষ্ঠানের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা হলেও কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দারা কলকাতার সাঁতার সমাজকে ধোঁকা দিতে পারেনি। তারা কার প্ররোচনায় এবং কি উদ্দেশ্যে রাতারাতি তাদের নাগরিকত্ব বিসর্জন দিয়ে ভোল পাল্টে ফেলল তার জবাব একমাত্র কলকাতার সাঁতারের সেই রজবুলিই দিতে পারে। কারণ সে আজ নিশ্চিত উপলব্ধি করছে কলকাতার সাঁতার সমাজে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে স্থানীয় ক্লাবগুলির সমর্থনই হবে বেঁচে থাকার একমাত্র হাতিয়ার। ●

প্রথম টেস্টে জয়ের বাসনা অনুপস্থিত ছিল

মাদ্রাজ থেকে আর অরবিন্দম

এই নিয়ে পরপর দুবার টেস্টে জয়লাভ করার সব রকম সুযোগ পেয়েও ভারত ব্যর্থ হল। এবং তা সামান্যর জন্যে; একথাও বলা যায়। ওভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতের জয়ের জন্য ছিল এক অবিচলিত ও উদগ্র বাসনা। সেখানে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে ভারত সুযোগ হাতছাড়া করল শুধুমাত্র খুব খারাপ ফিল্ডিং-এর জন্যে, যখন উইকেট-কিপার কিরমানি ছটি ক্যাচ তার গ্লাভসের মধ্যে দিয়ে গলালেন। কিরমানিকে ভারতের টেস্ট দলে ফিরিয়ে আনা হলেও খুব একটা সুবিধে এদিক থেকে হয়নি। সবচেয়ে যা অবাক করেছে, তা হল—জয় করার বাসনাই ছিল অনুপস্থিত।

খেলার মধ্যে ভারতীয় দলের ঢিলেঢালা ভাবটা ছিল পীড়াদায়ক, বিশেষ করে ফিল্ডিং-এর সময়। আর এই প্রসঙ্গে যজুরবেন্দ্র সিং-এর কথা চলে আসে। উইকেটের কাছে ফিল্ডিং-এ দক্ষ বলে কথিত যজুরবেন্দ্র ফরোয়ার্ড সর্ট লেগে এলান বর্ডারের ব্যাট থেকে উঠে আসা সটটি ফেলে দেন। বর্ডার তখনও কোন রান করতে পারেননি। ওই সময় কপিল বল করছিলেন। এরপর বর্ডার পিটিয়ে শুধু ১৬০ রান করলেন তাই নয়, খেলার চেহারাও ওই সঙ্গে পাল্টে গেল। কারণ এর আগেই কপিলের বলে গালিতে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে বেঙ্কটরাঘবন হিলডিচকে ইনিংসের শুরুতেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। গ্রাহাম উড (৩৩) এরপর দোশির বলে এল বি ডব্লিউ হয়ে যান। কিন্তু এরপর যখন ভারত তৃতীয় উইকেট পায় তখন অধিনায়ক কিম হিউস ও এলান বর্ডার জুটি ২২০ রান যোগ করায় রেকর্ড হয়ে গেল একটা। হিউস নিজে শুধু সেঞ্চুরি করেননি, সঙ্গী খেলোয়াড় বর্ডারকে সমানে উৎসাহিত করেছেন স্ট্রোকের সাহায্যে রান নিতে। ওই সময় অবশ্য বোলিং-এর মান ছিল মাঝারী রকমের এবং বলা যায় বিশেষ ধার ছিল না। কপিল এবং ঘাউড়ি দুজনেই এত খারাপ বল করেছিলেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই হিউস আর বর্ডার বোলারদের মাথায় চড়ে বসেন। অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর ভারতের নতুন স্পিনার জুটি বেঙ্কটরাঘবন ও দিলীপ দোশিকে ভাল করে কাজে লাগাতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিনে দুই উইকেটে ২৪৪ রান তোলে। দ্বিতীয় দিন ভাগ্য নিঃসন্দেহে



ভারতকে সাহায্য করেছিল যখন দিলীপ দোশি ছটি উইকেট দখল করে অস্ট্রেলিয়ার খুব বড় ইনিংসের সুযোগ নষ্ট করে দেন। অস্ট্রেলিয়া ৩৯০ রান করে। ন্যাটা স্পিন বোলার দোশি জীবনের প্রথম টেস্টে অনবদ্য বোলিং করে ১০৩ রানে ছটি উইকেট এক ইনিংসে দখল করলেন। দোশির বয়স এখন ৩২। দোশিকে দীর্ঘদিন বিষেণ সিং বেদীর ছায়ার আড়ালে কাটাতে হয়েছে।

তবে এসত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া অবশ্যই ভাল রকম রান করে। ভারতের পক্ষে প্রথম দিকে মাথা ঠাণ্ডা করে খেলা ছাড়া উপায় ছিল না। দ্বিতীয় দিনের শেষে চৌহানকে হারিয়ে ভারত এক উইকেটে ৮২ রান করল। গাভাসকরের সঙ্গে নৈশ প্রহরীর ভূমিকা নিয়ে সৈয়দ কিরমানি যোগ দেন। তৃতীয় দিনের শুরুতেই ভারত মুস্কিলে পড়ে যায় যখন গাভাসকর (৫০) সকালের দিকে আউট হলেন। প্রসঙ্গত মাদ্রাজে এটাই গাভাসকরের টেস্টে সবচেয়ে বেশী রান। কিরমানির সঙ্গে বিশ্বনাথ যোগ দিলেও এক বিচিত্র ধরনের খেলা শুরু হয়। যেমন খুব খারাপ, ভাল এবং সুন্দরের সংমিশ্রণে ব্যাটসম্যানরা স্ট্রোক নিতে থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার আর্ম-স্পিনার জিম হিগস বিশ্বনাথকে বারংবার ঠকান। বিশ্বনাথকে মাঝে মাঝে আনকোরা ব্যাটসম্যানের মতন হিগসের দিকে তাকাতে হয়েছে। কিরমানি সেখানে কিছুটা বেশী আস্থার সঙ্গে খেলে ৫৭ রান করে আউট হন। তার বাউণ্ডারির সংখ্যা ছিল ছটি। কিন্তু দিলীপ বেঙ্গসরকর যোগ দিলে খেলার মধ্যে গতি ও প্রাণের সঞ্চার হয়। ভারতীয় ব্যাটিং ওই সঙ্গে তার আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে ফিরে আসে। বেঙ্গসরকর ১১১ মিনিটে ৭৭টি বলে ৬৫ রান করেন। তবে হার্স্টের বলে ইয়ালপ সর্ট লেগে বেঙ্গসরকরের তোলা ক্যাচ ফেলে দেন। অব্যাহতি পাওয়ার পর বেঙ্গসরকর খুব ভাল খেললেও তার ইনিংসের পরিসমাপ্তি হয় কিছু হটকারি ব্যাটিং-এর জন্য। হিগসের এক ওভারে বেঙ্গসরকর ১৪ রান (একটি ওভার বাউণ্ডারি সমেত)। এরপর বলকে আকাশে পাঠান। ওয়াটমোর স্লিপে দাঁড়িয়ে ক্যাচটি অবশ্য সহজেই ধরেন। তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ৬ উইকেটে ৩০২ রান তোলে।

চতুর্থ দিনটি অবশ্যই কপিলের ছিল। শুরু থেকে মার, বেশীর ভাগ সময় বল জমির ওপর উড়ে গিয়েছে কিছুটা বাউণ্ডারি সীমানা পার হওয়ার আগে। বিশেষ করে হিগস বেশী রকমই মার খেলেন। কপিলের দ্রুত ৮৩ রানের মধ্যে ১৪টি বাউণ্ডারি এবং ৭৪টি বল থেকে পাওয়া। কপিলের সেঞ্চুরি করা উচিত ছিল। কিন্তু অহেতুক উঁচু করে হিগসকে মারতে গিয়ে লং-এ হার্স্টের হাতে ধরা পড়ে যান।

যশপাল শর্মার পঞ্চাশ রানের ইনিংসে একটা বাঁধুনী ছিল যেটা তৃপ্তি দেয়। ভারত ৪২৫ রান করে। হিগস ভারতের বিপক্ষে এক ইনিংসে সাত উইকেট পেয়ে লিণ্ডওয়াল, রিচি বেনো এবং ডেভিডসনের সঙ্গে একই সারিতে আসেন।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই ২ রানের মধ্যে গ্রাহাম উডকে হারালেও দিনের শেষে ৯৮ রান করে। পঞ্চম দিনের শুরু থেকেই মনে হয় খেলা ড্র হয়ে যাবে যদি না কোন অঘটন ঘটে। সেই অঘটনই ঘটতে পারত। কিরমানি হিলডিচকে বেঙ্কটের বলে ওঠা ক্যাচ ফেলে দেন যখন তার ৪৫ রান। কিন্তু বেঙ্কট বর্ডারকে (৫০) পান। এরপরই যজুরবেন্দ্র কিম হিউসের ব্যাট থেকে ওঠা বল ধরার পর এক প্রচণ্ড আবেদন করেন। কিন্তু আম্পায়াররা আবেদন গ্রাহ্য করেননি। এরপর যজুরবেন্দ্র সর্ট লেগে দাঁড়ান অবস্থায় হিউসের সুইপ থেকে আসা বলটিকে নাকে লাগান। দোশি বোলার ছিলেন ওই সময়। যজুরবেন্দ্র খেলায় আর অংশগ্রহণ করেননি। হিলডিচ ৫০ রান করে বিশ্বনাথের হাতে ক্যাচ আউট হওয়া থেকে অব্যাহতি পেলেও একটু পরেই ৫৫ রান করে দোশির বলে এল বি ডব্লিউ হন। ইয়ালপ এসেই কোন রান করার আগে রান আউট হন সর্ট লেগ থেকে বেঙ্গসরকরের অতর্কিতে ছোঁড়া বলে। দোশি বোলার ছিলেন। রান ৪ উইকেটে ১২৭। জয়ের একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতের গড়িমসি শুরু হয় তখন থেকেই। কিরমানি হিউসকে ফেলে দেন। ওয়াটমোর দোশির বলে চৌহানের হাতে ক্যাচ আউট হলেও কপিল পয়েন্টে দাঁড়ানো অবস্থায় রাইটের ক্যাচ ফেলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর বেঙ্কট অবশ্য রাইটকে বোল্ড আউট করার পর গাভাসকর গালিতে ডাইমকের তোলা ক্যাচ ফেলেন। বেঙ্কট অবশ্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হিউসকে এল বি ডব্লিউ করেন। ডাইমক আবার অব্যাহতি পান। শেষ পর্যন্ত ডাইমক ও রডনি হগ আরও এক ঘণ্টা খেলার পর গাভাসকর দ্বিতীয় নতুন বল নিয়ে খেলা শুরু করেন।

কিন্তু কোন লাভ হয় না। চা পানের এক ঘণ্টা আগে আলোর অভাব ও পরে প্রবল বৃষ্টি খেলার পরিসমাপ্তি ঘটায়।



স্পিনার দিলীপ দোশি



কপিলের দ্রুত ৮৩ রানের মধ্যে ১৪টি বাউণ্ডারি

স্কোর

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস

হিলডিচ ক বেঙ্কট বো কপিলদেব	৪
উড এল বি ডবলিউ বো দোশি	৩৩
বর্ডার রান আউট	১৬২
হিউস ক বেঙ্কট বো দোশি	১০০
ইয়ালোপ ক যজুর্বেন্দ্র বো দোশি	১৮
হয়াটমোর ক বেঙ্কট বো দোশি	২০
রাইট বো বেঙ্কটরাঘবন	২০
ডাইমক এল বি ডবলিউ বো কপিলদেব	১৬
হগ ক কপিলদেব বো দোশি	৩
হার্স্ট ক কিরমানি বো দোশি	০
হিগস অপরাজিত	১
অতিরিক্ত	১৩
মোট	৩৯০

উইকেট পতন : ১।৮, ২।৭৫, ৩।২৯৭, ৪।৩১৮, ৫।৩৩৯, ৬।৩৫২, ৭।৩৬৯, ৮।৩৭৫, ৯।৩৭৬।

বোলিং : কপিলদেব ২৫.৪-৩ ৯৫-২ ; ঘাউড়ি ২০-৪-৪৯-০ ; যজুর্বেন্দ্র সিং ৯-১-২৯-০ ; বেঙ্কটরাঘবন ৪৬-১৬-১০১-১ ; দিলীপ দোশি ৪৩-১০-১০৩-৬।

ভারতের প্রথম ইনিংস

গাভাসকর ক উড বো হগ	৫০
চৌহান ক রাইট বো হিগস	২৬
কিরমানি ক বর্ডার বো হগ	৫৭
বিশ্বনাথ ক হিউস বো হিগস	১৭
বেঙ্গসরকর ক হোয়াটমোর বো হিগস	৬৫
ইয়াসপাল শর্মা এল বি ডবলিউ বো হিগস	৫২
যজুর্বেন্দ্র সিং ক রাইট বো ইয়ালোপ	১৫
কপিলদেব ক হার্স্ট বো হিগস	৮৩
কারসন ঘাউড়ি অপরাজিত	২৩
বেঙ্কটরাঘবন এল বি ডবলিউ বো হিগস	৪
দোশি ক হগ বো হিগস	৩
অতিরিক্ত	৩০
মোট	৪২৫

উইকেট পতন : ১।৮০, ২।৮৯, ৩।১২২, ৪।২২১, ৫।২৪০, ৬।২৮১, ৭।৩৭১, ৮।৩১৪, ৯।৪১৭।

বোলিং : হগ ২২-১-৮৫-২ ; হার্স্ট ২৮-৮-৫১-০ ; ডাইমক ২৬-৬-৫৫-০ ; হিগস ৪১.৩-১২-১৪৩-৭ ; বর্ডার ১৪-৪-৩০-০ ; ইয়ালোপ ৬-১-২১-১।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস

হিলডিচ এল বি ডাবলিউ বো দোশি	৫৫
উড ক চৌহান বো কপিল	২
বর্ডার বো বেঙ্কটরাঘবন	৫০
হিউস এল বি ডবলিউ বো বেঙ্কট	৩৬
ইয়ালোপ রান আউট	২
হোয়াটমোর ক চৌহান বো দোশি	৮
রাইট বো বেঙ্কটরাঘবন	৫
ডাইমক অপরাজিত	২৮
হগ অপরাজিত	৮
অতিরিক্ত	১৮
মোট (৭ উইকেট)	২১২

উইকেট পতন : ১।২, ২।১০৩, ৩।১২৩, ৪।১২৭, ৫।১৪৬, ৬।১৫৬, ৭।১৭৫।

বোলিং : কপিলদেব ৯-২-৩০-১ ; ঘাউড়ি ১৭.৪-৮-২৩-০ ; দোশি ৪২-১৫-৬৪-২ ; বেঙ্কটরাঘবন ৪৫-১০-৭৭-৩।

খেলা অমীমাংসিত

যজুর্বেন্দ্র ও বিলাতী হেলমেট


যজুর্বেন্দ্র সিং

মাদ্রাজ থেকে রায়ান অমলরাজ : বত্রিশ পাউণ্ড-স্টার্লিং দিয়ে যজুর্বেন্দ্র একটি ডানকান হেলমেট এনেছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। শেষ পর্যন্ত হেলমেটও তাকে বাঁচাতে পারেনি। আসলে হেলমেটটি সবসময়ই তাকে অসোয়াস্তিতে ভোগাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই সে ওটি খুলে ঘাড় ঘোরাচ্ছিল। যাতে স্পষ্ট একথা বোঝা যাচ্ছিল, হেলমেটটির ওজন তাকে মুস্কিলে ফেলেছে। প্রথমে তো সে মুখের গার্ডটা খুলেও রেখেছিল। পরে হেলমেটটি পরে নেয়। সম্ভবত মুখের গার্ডটা দৃষ্টি নিবেশে বাধার সৃষ্টি করে।

প্রথম টেস্টের শেষ দিনে হিলডিচ দিলীপ দোশির একটি বল সুইপ করলে ফরোয়ার্ড সর্ট লেগে যজুর্বেন্দ্রর মুখে লাগে। সম্ভবত তার নাকের হাড় ভেঙেছে। আহত হওয়ার পর সে আমাকে বলে, দেখার অসুবিধা দূর করার জন্য ওইদিন সে 'ফেসগার্ড' খুলে রেখেছিল।

আহত হওয়ার আগে সে কিন্তু স্বীকার করেনি, হেলমেট তার মনঃসংযোগ বা দৃষ্টি-নিবেশে কোন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে জানায়, ইংল্যাণ্ড-অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ার্লীর উপদেশমত সে এই হেলমেট পরা সঙ্গত মনে করেছে। সে বলে, হেলমেট থাকলে একনাথ সোলকারের মাথায় বল লেগে আঘাতটা এতো মারাত্মক হতো না।

সে বলে, এই অস্ট্রেলিয় দলের অনেক ব্যাটসম্যানেরই একটি উঁচু করে সুইপ করার ঝোঁক আছে। স্পিনারদের সময় ওই মারগুলি ক্লোজ-ইন ফিল্ডারদের বিপদ হয়ে উঠতে পারে। ফলে এরকম দলের বিরুদ্ধে হেলমেট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অবশ্য অনেকেই মনে করেছেন, হেলমেট পরলে শরীর ও চোখ যে অসোয়াস্তিতে ভোগে তাতে ওই বিপদজনক অঞ্চলের ফিল্ডারদের মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। কোন মত ঠিক সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে হেলমেট সত্ত্বেও যজুর্বেন্দ্রর লেগেছে এবং পরিণতিতে সে বাঙ্গালোরে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদও গেছে।

হাসপাতালে যজুর্বেন্দ্র জানায়, তার একটি শিক্ষা হল। ভবিষ্যতে সে ফেসগার্ড খুলে রাখবে না। এধরনের ঝুঁকি নেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

হগ সম্পর্কে রঙ্গচারী

রডনি হগ কেমন ফাস্ট বোলার? বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকর এ প্রশ্নের উত্তর একটি মাত্র টেস্ট খেলার পর দিতে রাজী হয়নি।

তবে ১৯৪৮ সালে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রখ্যাত ব্যাটসম্যান জর্জ হেডলির অফ-স্টাম্প যার বলে খণ্ড বিখণ্ড হয় (যা একটি ভারতীয় রেকর্ড) সেই ভারতীয় বোলার সি আর রঙ্গচারীর মতে, হগ একজন সত্যিকারে পেস বোলার। ও যদি ওর বাঁ কাঁধটি ব্যাটসম্যানের দিকে রেখে বল ডেলিভারি করে তবে খুব ভাল ফল করবে। আর বল করার পর ফলো থ্রুর উন্নতিও করতে হবে।

হগের সামনে বোলিং রানআপও একটি সমস্যা। মাদ্রাজ টেস্টে সে ২১টি নো-বল করেছে। তবে এমন সবল কাঁধের অধিকারী হগের ভবিষ্যত সম্ভবনাময়।

নিরানব্বুইতে নার্ভাস

এলান বর্ডার মাদ্রাজ টেস্টে ৯৯ রানে পৌঁছনোর পর ১৫ মিনিটের বেশি সময় নিয়েছে সেঞ্চুরি পূরণে। সে ভেঙ্কটরাঘবনের ১৪টি বল খেলেছে এবং একটি আকাঙ্খিত রান নিতে সাহস পায়নি। শেষ পর্যন্ত দিলীপ দোশির একটি বল তেড়েফুঁড়ে মেরে সে সেঞ্চুরি পূরণ করে।

মেরিম্যান বলেন

অস্ট্রেলিয় ম্যানেজার রবার্ট মেরিম্যান বলেছেন, ভারতীয় দল সত্যিকারের ভালো ব্যাটিং সাইড। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে দল শেষ ইনিংসে চারশো রান করে তাদের ব্যাটিং শক্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাকে বলেন, তোমাদের দুজন বিশ্ব পর্যায়ের ব্যাটসম্যান রয়েছে গাভাসকর ও বিশ্বনাথ। যদি ওরা ব্যর্থ হয় তাহলেও ছ'জন মোটামুটি চালিয়ে নেবার মতো ব্যাটসম্যান রয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান দলটি সম্পর্কেও তার ধারণা উঁচু। তার মতে, ব্যাটিং এ তার দল ভারত থেকে কোন অংশে কম যায় না। এই অস্ট্রেলিয় দলটিই পাকিস্তানকে হারিয়েছে, আর পাকিস্তান ভারতকে। দলের অনেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাকিস্তান ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলেছে। মেরিমানের আশা, অস্ট্রেলিয়াই সিরিজ জিতবে। তার দল ব্যাটিং, ফাস্ট বোলিং ও স্পিন বোলিং সব দিক থেকেই বেশ শক্তিশালী। বর্তমান দলটি দ্বিতীয় স্তরের বলেও মেরিম্যান মানতে রাজী নন।

প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৯০ করার পর তার আশা ছিল জিতে যাবেন। বিশেষ করে গাভাসকর ও বিশ্বনাথ আউট হওয়ার পর। সেসময় যজুর্বেন্দ্র আর যশপাল ঠেকিয়েছে। অথচ ওদের বিরুদ্ধে ধীরগতি ব্যাটিং এর জন্য সমালোচনা হয়েছে। মেরিম্যান বলেন, এই দুজন বেঙ্গসরকর বা কপিলদেবের মতো প্রশংসা পাবার যোগ্য।

মেরিম্যান মনে করেন, ভ্যাপসা গরমের জন্য হগ তার চরম উৎকর্ষতা মাদ্রাজে দেখাতে পারেনি। একই কারণে তার অতগুলি নো বল হয়েছে। অস্ট্রেলিয় ম্যানেজার ভারতীয় আম্পায়ারদের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

শিল্ড ফাইনাল '৭৯


খেলা শেষ—মোহনবাগানের মানস ধরা পড়ল
এক সমর্থকের আলিঙ্গনে/শংকর




বল মাথায় নিতে সবার উপরে সুব্রত ভট্টাচার্য /অমিয় তরফদার


শিবাজী ব্যর্থ করল সাব্বিরকে পাশেই সুব্রত ভট্টাচার্য ও ডেভিড উইলিয়ামস / পাহাড়ী


বলের লড়াই—ডেভিড উইলিয়ামস, প্রসূন ব্যানার্জি, কম্পটন দত্ত ও দেবরাজ/তরুণ মুখার্জি





খেলা তখন চলছে/শংকর



গোল— জিতেছি, মোহনবাগান সমর্থকদের উল্লাস/অরুণ মুখার্জি

মোহনবাগান ঃ ইস্টবেঙ্গল



মোহনবাগান গোলমুখে বলের দখল নিয়ে উদ্বেগ-ডেভিড, প্রতাপ, দেবরাজ, সুব্রত ভট্টাচার্য, মনজিত ও কম্পটন দত্ত/অরুণ





সাফল্যের বিড়ম্বনা, কোচ পি কে দর্শকদের পাল্লায় পড়ে অস্থির / অরুণ মুখার্জি

মফঃস্বল বাংলার ক্লাবগুলির মূলধন অর্থ নয়, আন্তরিকতা

সমীরণ রায় : গরু—১.১৮,৭৮,০৮৩ : মোষ—৮,২৪,১৬১ : ভেড়া—৭,৯৩,৩৬৯ ; ছাগল—৫২,১১,৪৪৫ ; ঘোড়া ও খচ্চর—১৪,৫৪৮ এবং শুয়োর—৩,৬১,৮২২। হিসাবটা ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের গৃহপালিত জীবজন্তুর।

সূচনাতেই শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতিহীন প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য পাঠকবর্গ বর্তমান প্রতিবেদকের সুস্থতা সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু অনুগ্রহ করে বিশ্বাস করুন, বিস্তর পরিশ্রম করেও পশ্চিমবঙ্গের ১৫—৩০ বছর বয়সী যুবক-যুবতীর পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অথচ মনুষ্যেতর প্রাণীর পরিসংখ্যান সহজলভ্য শুধু নয়, রীতিমত সুনির্দিষ্ট। যুবশক্তি সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধিৎসা কত্ত ভয়ানকভাবে কম, উপরের তথ্য সেটাই প্রমাণ করছে।

১৯৭১ সালে জনগণনা হয়েছিল। সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৪.৪৩,১২,০১১ জনের মধ্যে কতজন পুরুষ, কতজন স্ত্রীলোক সে তথ্যও অমিল নয়। কিন্তু সমগ্র দেশের জনশক্তির পরিসংখ্যান থেকে যুব-সম্প্রদায়ের শক্তি নিরূপণের কোন উপায় নেই। সে ধরনের কোন প্রয়াস সরকারী বা বে-সরকারী কোন স্তর থেকে করা হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। অথচ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই যুবক ও যুব কল্যাণের বিষয়গুলি ক্রমশই গুরুত্ব পাচ্ছে। পৃথক দপ্তরও খোলা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু একথা খুব স্পষ্ট করেই বলা যায়, আমাদের দেশে যুব কল্যাণের ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়াসটি যথেষ্ট বিজ্ঞান-সম্মতভাবে শুরু হয়নি। হলে, যুবকদের সংখ্যাগত শক্তিই আগে নির্ধারণ করা হত। তারপর পরিকল্পনা গ্রহণ, ব্যয় বরাদ্দ ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়েছে উল্টো।

যুবকরা সংগঠন তৈরি করেন। যে সংগঠনের কথা বলছি সেগুলির লক্ষ্য : হয় সমাজসেবা অথবা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, নয়তো খেলাধূলার চর্চা ও উন্নয়ন। শেষের বিষয়টি অর্থাৎ খেলাধূলাকেন্দ্রিক যুব সংগঠন-গুলি নিয়েই আজকের প্রতিবেদন। এবং তার পরিধি—মফঃস্বল বাংলা।

মফঃস্বল বাংলায় কতগুলি যুব সংগঠন এই খেলাধূলার চর্চায় ব্যাপৃত রয়েছে ?

না, তার কোন সরকারী পরিসংখ্যান নেই।

খেলাধূলার জন্য যুবক পিছু বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ এই পশ্চিমবঙ্গে কত ?

না, সেটাও বলবার উপায় নেই।

অথচ, চাহিদার পরিমাণটা না জানতে পারলে সরবরাহ বেশি কি কম, সেটা জানা যায় না। এক্ষেত্রে ক্লাবগুলির সংখ্যা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে না পারলে সরকারী ভূমিকাটাও স্পষ্ট করে তোলা যাবে না।

কলকাতা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাকি অঞ্চলকে বলছি—মফঃস্বল বাংলা। সেখানে ডেভেলপমেণ্ট ব্লকের সংখ্যা ৩৩৫ এবং পৌরসভা ৯৬। অনুমান করা যাক, ব্লক ও পৌরসভা পিছু গড়ে ২৫টি ক্লাব সক্রিয়ভাবে নিজ নিজ এলাকায় খেলাধূলায় অংশ নিচ্ছে, খেলাধূলার সাধ্যমত আয়োজন করছে। তাহলেও পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলে স্পোর্টস ক্লাবের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১০,৭৭৫ (১৯৭৮-৭৯, এই আর্থিক বর্ষেই পশ্চিমবঙ্গে অ-বাণিজ্যিক সংস্থা হিসেবে সরকারী রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে ২৪৬৯টি সংগঠন। তার মধ্যে ক্রীড়া সংগঠনের সংখ্যা শতকরা অন্তত ৭০ ভাগ)। এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যদি এই পরিমাণ ক্লাবের সঙ্গে ক্লাব পিছু ১০০ জন সদস্য বা সমর্থক যুক্ত থাকেন তাহলে দশ লক্ষাধিক যুবক-যুবতী খেলাধূলার সঙ্গে অন্তত মফঃস্বল বাংলায় সংযুক্ত আছেন, এটা ধরে নিতে হয়।

আর মফঃস্বল বাংলা সঙ্গত কারণে এটাও দাবি করতে পারে যে, ভারতবর্ষের ক্রীড়া-মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ যতগুলি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে, তার মূলে মফঃস্বল বাংলার ওইসব স্বল্প পরিচিত, অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত ক্রীড়া সংগঠনগুলির অবদান মোটেই কম নয়। ফুটবলের সুরজিত সেনগুপ্ত, বিদেশ বসু, সুব্রত ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলি, সমরেশ চৌধুরী, মিহির বসু প্রমুখ ; অ্যাথলেটিক্সে অণিমা ব্রহ্ম, সুব্রতা দেবনাথ, শ্রীরূপা চ্যাটার্জি, অনুভা চ্যাটার্জি ; তীরন্দাজীতে চন্দ্রকুমার দাস, কৃষ্ণ দাস ; জিমন্যাস্টিক্সে অমিয় মল্লিক, গোরা মল্লিক, শেফালী মজুমদার, চন্দনা চক্রবর্তী ; ব্যাডমিণ্টনে মধুমিতা গোস্বামী ; সাঁতারে ইলা পাল, আশিস দাস এবং আরো অনেক—এরা সকলেই মফঃস্বল বাংলার এক একটি গৌরবময় উপহার। এছাড়াও ভলিবল, কবাডি, খো-খো প্রভৃতিতে মফঃস্বল বাংলার প্রতিনিধিত্ব শুধু উল্লেখ-যোগ্য নয়, অনেক ক্ষেত্রে অভাবিত।

কিন্তু এই সমস্ত সাফল্যের অন্তরালে যে সকল প্রতিষ্ঠান দিন নেই রাত নেই নিজেদের নিবেদিত রেখেছে তাদের আভ্যন্তরীণ চিত্রটি নিতান্ত দুর্ভাগ্য পীড়িত। কারণ এ কাজে তাদের একমাত্র মূলধন—আন্তরিকতা। অভাবটা মূলত অর্থের, সুযোগ সুবিধার এবং কোথাও কোথাও শুভেচ্ছার, সহমর্মিতার।

প্রসঙ্গান্তরে শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতার অভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা যাবে। আপাতত ক্লাবগুলি পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠকরা যে নিত্যদিন বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন—সেগুলিকেই খতিয়ে দেখা যাক এবং সে সমস্ত নিরসনের জন্য সরকারী প্রয়াস কি ও কতখানি সেটাও তলিয়ে দেখতে বাধা নেই।

ক্লাবগুলি খেলার জন্য মাঠ চায়, সরঞ্জাম চায়, চলনসই একটা ক্লাব হাউস চায়। সেই সঙ্গে আরো চায় প্রশিক্ষণ, টিফিন ইত্যাদি। কিন্তু মাসিক চাঁদা ১ টাকা করে হলেও ১০০ জনের ক্লাবে বৎসরে মোট আয় দাঁড়ায় ১×১০০×১২=১২০০ টাকা। তাতে নিজস্ব খেলার মাঠ ও ক্লাব হাউসের পরিকল্পনা শিকেয় তুলে সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটাতে সংগঠকদের গলদঘর্ম হতে হয়। ক্লাব-অন্ত-প্রাণ সংগঠকদের কাউকে কাউকে ব্যক্তিগতভাবে ঋণগ্রস্তও হতে হয়। মাসিক চাঁদার বিরাট অংশই থাকে অনাদায়ী। ছাত্র সদস্যদের আবার কোন কোন ক্লাবে মাসিক চাঁদার কনসেশনাল রেট চালু আছে। হিসেবের সুবিধার জন্য মাসিক চাঁদা ১ টাকা ভাবলেও এই বাংলাদেশে চার আনা/আট আনা ক্লাবের সংখ্যাই বোধকরি সত্তর ভাগ। কাজেই বাস্তবে প্রকৃত আয়ের পরিমাণ যে ওই ১২০০ টাকার অনেক কম, সেটা সহজবোধ্য।



গ্রামের সংগঠকরা খেলাধূলার আয়োজনে বেশ সিরিয়স শিলিগুড়িতে—কবাডির আসর :



চুঁচুড়ার মাঠে ফুটবল (বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব : রাজেন্দ্র স্মৃতি সংঘ) দর্শকদের উৎসাহ সহরের থেকে কোন অংশে কম নয়।

ক্লাবগুলির পক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন ক্রীড়া-সরঞ্জাম, তার নিম্নতম বাজার-মূল্যটা কেমন ?

১। ফুটবল—৪৮.০০
ফুটবল বুট—৩০.০০
ফুটবল মোজা—৫১.০০ (ডজন)
গোল পোস্টের নেট—১৪০.০০
গোল পোস্ট : বাঁশ—৬০.০০
কাঠ—৫০০.০০

২। ভলিবল—৪০.০০
ভলিবল নেট—৪২.০০
ভলিবল পোস্ট
বাঁশ—২০.০০
কাঠ—১০০.০০

৩। অ্যাথলেটিক্স :
শট—১২.০০
ডিসকাস—৩৫.০০
জ্যাভেলিন—৪০.০০
রানিং শু—৩২.০০

৪। ক্রিকেট সেট— ৩৫০.০০

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। সম্বৎসরের জন্য ক্লাবের খেলোয়াড়দের এক বা একাধিক খেলার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করাই ক্লাবের প্রধান দায়িত্ব। তার পরের প্রশ্ন, নিয়মিত অনুশীলন, বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং নিজেদের ক্লাবের পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টের আয়োজন। এসব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে টুর্নামেন্টের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে, সমাজের সচ্ছল ও উদার-হৃদয় কিছু মানুষ এখনো এগিয়ে আসছেন। তারা তাদের কোন প্রিয় স্মৃতিকে এই সমস্ত খেলাধূলার মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখতে চান। দায়িত্ব এবং ঝক্কি-ঝামেলা হাসিমুখে গ্রহণ করে ক্লাবগুলি। মফঃস্বল বাংলায় খেলাধূলা নিয়ে যতটুকু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় তার কেন্দ্রমূলে রয়েছে ওইসব দানশীল মানুষের সৌজন্য-ধন্য টুর্নামেন্টগুলি। যার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্থানীয় জেলা কিংবা কলকাতার মাননীয় অতিথিবর্গ অনুগ্রহ করে উপস্থিত হবার সম্মতি দিয়ে থাকেন। উদ্যোক্তারা কৃতার্থ হন।

আজ যারা প্রবীণ, এককালে খেলাধূলা করতেন তারা প্রায়শই বলেন, 'আমাদের সময়ে এমনটি ছিল না, সরকার থেকে খেলাধূলায় মদত দেওয়ার ব্যাপারটা হাল আমলের।' কথাটা অসত্য নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মফস্বলের ক্লাবগুলি এ থেকে কতটুকু সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারছে সে খবরটা তাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে। যথোচিত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। কারণটা কি ? সরকারী সদিচ্ছার অভাব ? গ্রামবাংলার প্রতি সাধারণ উপেক্ষা ? অবহেলা ? না, অন্য কিছু ?

সঠিক উত্তরটা বেছে নেওয়া বেশ কঠিন। তবে দু'একটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে হয়ত কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

যেমন ধরুন, ১৯৭৮ সালে বিভিন্ন সংস্থাকে খেলাধূলার উন্নতিকল্পে সাহায্য হিসাবে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পোর্টস

কাউন্সিলকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিল (সূত্র: যুব মানস। নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা। ১৯৭৮—পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

এই পাঁচ লক্ষ টাকা বিলি বণ্টনের জন্য কাউন্সিল কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল?

সাধারণত, সরকারী অর্থের বিলি বণ্টনে জেলাওয়ারী নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং জেলা প্রশাসন সেই অর্থকে মহকুমা ব্লক পর্যায়ে ভাগ করে দিয়ে থাকে। উপরন্তু, মঞ্জুরীকৃত অর্থ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়েছে কি না, সে মর্মে একটি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পরবর্তীকালে পেশ করা সরকারী অর্থনৈতিক বিধি অনুসারে বাধ্যতামূলক।

যতদূর খবর, সরকারী ক্রীড়া খাত থেকে অর্থের বিলি-বণ্টনে এ ধরনের জেলাভিত্তিক পদ্ধতি সচরাচর অবলম্বন করা হয় না, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার আর্থিক বিধিও পালন করার সুযোগ থাকে না। গত সাত বছরে একবার মাত্র জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নির্ধারিত ক্লাবগুলির মধ্যে খেলাধূলার কিছু সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছিল। তারপর এতাবৎ হয়নি।

এটা আনন্দের কথা, বর্তমান সরকার স্পোর্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে খেলাধূলাকে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে দিতে চায়। কাউন্সিলের পুনর্গঠনও করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। সরকারী ক্রীড়া প্রকল্পগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব এই পর্ষদের। কিন্তু কাউন্সিলের প্রশাসনিক ক্ষমতা কতটুকু? নিজস্ব লোকশক্তি কি পরিমাণ?

ইডেন গার্ডেনসের বাইরে স্পোর্টস কাউন্সিলের কোন নিজস্ব মেশিনারি নেই। এমনকি সরকারী ক্রীড়া দপ্তরেরও নেই। অথচ সরকারী সাধারণ প্রশাসনকেও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার তেমন উদ্যোগ নেই।

ফলত খেলাধূলাকে উৎসাহিত করবার সরকারী পরিকল্পনা যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করতে পারছে না। নেট-ওয়ার্কের অভাবে মফঃস্বল বাংলার ক্লাবগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী সদিচ্ছাটুকু কাজে লাগাতে পারছে না। কোন স্কিম কখন আসছে, কী হচ্ছে। তার সংবাদ ওই ইডেন উদ্যান থেকে কী করে মফঃস্বলের ক্লাবগুলি পাবে? পায় না। সম্ভবত ওই পাঁচ লক্ষ টাকারও একই ইতিহাস। একই পরিণতি। দূর ক্লাবগুলি কোনক্রমে বেঁচে বর্তে থাকে উদ্যোগী সংগঠকদের মেহনতে। মাঝে মধ্যে তারা শুধু এখানে সেখানে আবেদন নিবেদন করেন।—

বিশেষ করে গ্রামের ক্লাবগুলির ওই আবেদন নিবেদনের দৌড় তাদের 'ব্লক অফিস' পর্যন্ত। কারণ, গ্রামাঞ্চলে সরকার বলতে ওই 'ব্লক'। ব্লক অফিসই তাদের রাইটার্স বিল্ডিংস। অথচ ব্লকের ডেভেলপমেন্ট অফিসার যে এ ব্যাপারে কত অন্ধকারে সেটা বোঝার কথা তাদের নয়। আর বি ডি ও সাহেরা এ কথাটা মুখ ফুটে বলতে দ্বিধা করেন। হয়ত ঔচিত্যবোধে বাধে, নয়তো প্রেসটিজে। তাই যে কোন আবেদন 'স্ট্রংলি রেকমেনডেড অ্যাণ্ড ফরোওয়ার্ডেড' করে এস ডি ও সমীপে পাঠিয়ে সরকারী কর্তব্য পালন করেন। কালে ভদ্রে ডি এমের ডিসক্রিশানারী গ্রাণ্ট আসে। তখন কোন পুরস্কার বণ্টন অনুষ্ঠানে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার সুযোগ পান। টাকার অঙ্কে সে সাহায্যের পরিমাণ ৫০—১০০ টাকা।

জেলায় ফিজিকাল এডুকেশন অফিসার রয়েছেন। তাঁরা শিক্ষা দপ্তরের কাছে দায়িত্ববদ্ধ। ক্রীড়া দপ্তর বা স্পোর্টস কাউন্সিলের সঙ্গে তাদের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ নেই। তারা সরকার থেকে এখনো যুব কল্যাণে জন্য বৎসরান্তে ১ হাজার টাকা পান। জেলা শাসকের সম্মতি নিয়ে ৫০/১০০ করে বিলি করে দিতে পারলেই তাদের দায়িত্ব শেষ হল।

অতএব, শেষ অবধি প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে; খেলাধূলার উন্নয়নে

সরকারী অর্থের কী হচ্ছে? কারা পাচ্ছে? নির্দিষ্ট অর্থ খরচ করা সম্ভব হচ্ছে কী?

অবশ্যই হচ্ছে।

সরকারী দৃষ্টিকোণ থেকে খরচ করতে না পারা বিশ্রী দৃষ্টান্ত। তাই বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোচিং ক্যাম্প, কোথাও মাঠ কেনার টাকা, কাউকে সরঞ্জাম কেনার টাকা দিতেই হয়। আর এক্ষেত্রে মুখ চেনাচেনি, আলাপ পরিচয়, সুপারিশের জোর এগুলি খুবই কার্যকরী হয়। উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি দূরবর্তী জেলাগুলিকে অনেক সময় এই সব পরিস্থিতিতে ভৌগোলিক কারণেই বঞ্চিত হতে হয়। সিদ্ধার্থ সরকারের শেষ বছরে এমন ক্লাব / অ্যাসোসিয়েশন সরকারী সাহায্য পেয়েছিলেন যারা ভুলেই গিয়েছিলেন—অর্থ সাহায্যের আবেদন তারা কোনকালে করেছিলেন বা তাদের দরখাস্ত-পত্র আদৌ ঠিকঠাক ছিল কিনা। আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকটা ঠিক ক্লিয়ারেন্সের মত। মার্চ মাস, টাকা ছিল। দিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুরনো ফাইলপত্র খুঁজে পেতে। যেখানে যত দরখাস্তকারী ছিল প্রায় সকলকেই। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে পরস্পর সংযোগ সমন্বয় না থাকায় একই ক্লাব / অ্যাসোসিয়েশনের ভাগ্যে সরকার থেকে একই বৎসরে বা পরপর বছরগুলিতে একাধিক সাহায্য লাভের ঘটনাও বিরল নয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে সেই সংস্থার অবদান ষোল আনা শূন্য হওয়াও আশ্চর্য নয়। আর অন্যদিকে দূর মফঃস্বল বাংলার অনেক ক্লাব সরকার থেকে সামান্য সাহায্য বা শুভেচ্ছার জন্য চাতক প্রত্যাশা নিয়ে উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। নিজস্ব সম্বল—তাদের আত্মপ্রত্যয়, সংগঠনের জন্য প্রশ্নহীন আন্তরিকতা সর্বোপরি খেলাধূলার জন্য গভীর ভালবাসা।

খেলাধূলার দৌলতে

গত তিরিশ বছরে যত ওলিম্পিক গেমস, খেলাধূলার বিশ্ব বা ইউরোপীয়ন চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছে—তার সব কটাতেই জার্মানির বিয়ার কোম্পানির সাহায্যপুষ্ট স্পোর্টসম্যানরা যোগ দিয়েছেন। এই স্পোর্টসম্যানদের সংগ্রহের তালিকায় আছে কম করেও ১৬টি ওলিম্পিক পদক, গোটা তিরিশেক বিশ্ব ও ইউরোপীয় খেতাব ও ৭০০-রও বেশী জার্মান চ্যাম্পিয়নশিপ।

বিয়ার কোম্পানির নাম এখন যেমন জগৎজোড়া, তার অ্যাথলিটদেরও তাই। এই কোম্পানি খেলাধূলার চর্চার জন্য বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ জার্মান মার্ক খরচ করে থাকে। এভাবে দু'হাতে পয়সা খরচের কারণ হিসাবে কোম্পানির ডিরেক্টর হারবার্ট গ্রুনেওয়াল্ড খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন, 'খেলোয়াড়দের এই সাফল্য বিয়ার কোম্পানির খ্যাতি স্বদেশে ও বিদেশে বহু পরিমাণে বাড়িয়েছে।'

বিয়ার কোম্পানির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন আরো বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। ইস্পাত শিল্প, প্রকাশন সংস্থা, বীমা কোম্পানি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতি বছরই স্পোর্টস বাজেটের হার দ্রুত বাড়ছে। এটা যে শুধুই খেলাধূলার স্বার্থে, এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা এখানে কেবলই দয়ালু মনোভাবের পরিচায়ক, তা নয়। স্বার্থ তাদের দিক থেকেও আছে। মালিকপক্ষ দেখেছে খেলাধূলার চর্চা যেসব কর্মী করে, তারা সকলেই অন্যদের তুলনায় শারীরিক ও মানসিক ভাবে অনেক বেশী ফিট। তারা সুস্থ সবল শরীর নিয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে পারে।



ম্যাচ রিপোর্ট

মুস্তাফা নাশাদ

ঘটি আর বাটিতে
যুদ্ধ হল মাটিতে।
কি ভীষণ বাপরে—
যেন সব সাপরে।
কুণ্ডলী পাকিয়ে
গোল মুখে ঝাঁকিয়ে
বসে করে ফোঁসফাঁস,
লোক দেখে দেয় পাস।
মাঝ মাঠে ধরে বল
খাটে না যে কোন ছল।
পলে পলে করে কিক্
বল ধরে ফেলে ঠিক্।
একবার ফসকায়
সোজা গোলে বল যায়
বাজে শাঁখ ঘণ্টা
মহা উৎকণ্ঠা।
কি যে হয়, কি যে হয়
কেউ নাহি কথা কয়।
হায়-হায় গেল ম্যাচ
কি দারুণ দিল প্যাঁচ।
শোর-গোল-শব্দ
করে দিল জব্দ।
ভুল হল যেই চালে
বল গেল সেই জালে।
গোল-গোল, শোধ গোল
তোল বাছা মুখ তোল।

জেতা ম্যাচ ফসকায়
ভাঙে,—নাহি মচকায়।
লড়ে যায় পুরো দমে
উৎসাহ নাহি কমে।
ম্যাচ জেতা চাই যে
বিকল্প নাই যে।
দাও বল—বল দাও
গোল যদি সবে চাও।
রেফারি দ্যাখে ঘড়ি
সময় যে নাই হরি।
বাজল যে বাঁশী ভাই
খেলা শেষ! বাড়ি যাই।



বৃষ্টিতে ইডেনে যাতে জল না দাঁড়ায়

প্রশান্ত ভট্টাচার্য ঃ অস্ট্রেলিয়া আসছে অক্টোবরের শেষে। যা আমাদের বৃষ্টি, তাতে খেলা হলে হয়। সারা দুনিয়ায় যখন ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, তখন আমাদের কলকাতা শুধু ভাসে, জলে মাঠ টৈ টম্বুর। জল শুকোতে শুকোতে নভেম্বর কাবার। সেই ডিসেম্বরে কলকাতার ক্রিকেটাররা বুক ফুলিয়ে মাঠে নামতে পারবেন। হাত জমাতে না জমাতেই বড় খেলা। তখন চক্ষু ছানাবড়া, আমাদের ছেলেদের অবস্থা কাহিল। এই তো চলছে বছরের পর বছর। ব্যতিক্রম তো কিছুই দেখিনা। অথচ হলফ করে বলতে পারি অন্য দেশের মত সারা বছর বাংলার ছেলেরা যদি প্র্যাকটিস পায়, ম্যাচ খেলতে পায়, তাহলে তারাও লড়বে সমান তালে।

এখনও বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রচুর। বলতে গেলে টানা সেপ্টেম্বরটাই বৃষ্টির মাস। ইডেনের কালো মাটি শুকোতে বেশ সময় লাগে। পাঁচ দিনের টেস্ট উইকেট এত অল্প সময়ে গড়ে তোলা কম শক্ত কথা নয়। তারপর গতবারের মত যদি অতি বৃষ্টি হয় তাহলে'ত কথাই নেই। খেলা লাটে উঠবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ইডেনের বাউণ্ডারি লাইনে গিয়েই থমকে গেলাম। যুদ্ধের সময় মাঠে যেমন ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল বোমার ভয়ে মাথা গোঁজবার জন্যে, তেমনি ঠিক সারা মাঠের বাউণ্ডারি লাইন ধরে বৃত্তাকারে দু'আড়াই গজ চওড়া মত কাটা। আর সেই কাটা অংশে জল সরছে। কোন রকমে ডিঙ্গোলাম। কিছু একটা হচ্ছে বুঝতে পারলাম। ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি, কেননা এই অবস্থায় কাউকে না জিজ্ঞেস করে মাঠে ঢুকে পড়া উচিত হচ্ছে না হয়ত। কিন্তু দূরে দেখলাম সি এ বি-র গ্রাউণ্ড কমিটির চেয়ারম্যান কালো চ্যাটার্জিকে। তারই পাশে দাঁড়িয়ে হেড মালি নকুল রাউত। কিছু চিন্তা ভাবনার কথা নিয়ে তারা কালোদার সঙ্গে আলোচনা করছে। কালোদা বললেন 'দেখোত্ত, যে জায়গা দিয়ে এলে তার থেকে এ জায়গা বেশী শুকনো কি না।' অর্থাৎ আমি বাউণ্ডারি লাইন ছেড়ে প্রায় পিচের দিকে ঢুকে পড়েছি। ঢুকে পড়েছি আর একটা সেই একইভাবে বৃত্তাকারে কাটা অংশ ডিঙ্গিয়ে। তাই কালোদার কথায় এতটুকু চিন্তা না করেই বললাম; 'এটা কি করে সম্ভব হলো? সত্যিই বাউণ্ডারি-লাইনের থেকে যত ব্যাটিং ক্রিজে এগোচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে জায়গাটা বেশ শুকনো আর খটখটে। কালোদা স্মিত্তির হাসি হাসলেন। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে আগ্রহ দেখালেন। একটা কিছু হচ্ছে পরিকল্পনা মাফিক তা বুঝতে আর বাকি রইল না। পঞ্চাশ-ষাট জনের মত লোক কি আর অমনি অমনি খাটছে। ব্যাটিং ক্রিজের কাছে আর একটি বৃত্তাকারে কাটা অংশটুকু দেখিয়ে কালোদা বললেন, 'এখন এই কাটা অংশের ভেতর কিছু পাথর নুড়ি আর বালি দেখছো। এর তলায় কিন্তু মোটা মোটা পাইপ বসেছে। মাঠের জল গড়িয়ে বালি আর পাথরের নুড়ির তলা বেয়ে সোজা ড্রেনে গিয়ে পড়বে।' আমার হাত ধরে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন তারপরের কাজটা কি হচ্ছে। বাধা দিয়ে বললাম, 'জল কি সত্যিই এই ড্রেনে গড়াচ্ছে।' কালোদা আর কথা বাড়ালেন না। একটা কাগজ ফেলে দেখিয়ে দিলেন জল কেমন নর্দমার ভেতর গড়িয়ে চলেছে। এবার যেখানে নিয়ে এলেন, সেখানে দেখলাম পিচের সেই বৃত্তাকারের সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে ছটি জায়গায় কাটা হয়েছে আর সেগুলি মিশেছে বাউণ্ডারি লাইনের বৃত্তাকারের কাটা অংশের সঙ্গে। যাতে পিচের জল সেই লম্বা কাটা অংশ ধরে সোজাসুজি বাউণ্ডারি লাইনের বৃত্তাকারের কাটা অংশে জল সরে যেতে পারে।' অর্থাৎ পাকাপাকি ড্রেন সিসটেম। সারা মাঠ জুড়েই পাইপ বসছে জল সরানোর জন্যে। দেখলে অবাক হতে হয়। রাস্তাঘাটে সি এম ডি এ যে পদ্ধতিতে ড্রেনের পাইপ বসাচ্ছে রাস্তায় জল না দাঁড়ায়; মাঠেও ঠিক একই ধারায় জল সরানোর ব্যবস্থা



মাঠের জল বের করে দিতে পরিকল্পনার রূপায়ণ চলছে ইডেনে / শঙ্কর



ইডেনের বুক চিরে কাজ চলছে / শঙ্কর

করা হচ্ছে। আমি আই এফ এ শিল্ড ফাইনালের পরের দিনই ইডেনে হাজির হই, তাদের কাছেই শুনলাম ইডেনে এই কাজ হচ্ছে মাত্র দশদিন ধরে। দশদিনে এত কাজ এগিয়েছে। কাল্যোদা বললেন, 'হবে না, সেপ্টেম্বরেই কাজ শেষ করতে হবে। তারপর মাটি চাপা দেওয়া, ঘাস বোনার কাজও তো সারতে হবে ওই কাটা অংশের ওপর। তবে পিচের কাজ কমপ্লিট। মাটি দেওয়া, ঘাস বোনা সব। এমন কি প্র্যাকটিসের পিচও তৈরি।' কাল্যোদাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম, 'আচ্ছা এত বিরাট কাজ, খরচপাতি যোগাচ্ছে কে?' 'কেন? সরকার!' এক ঝটকায় কাল্যোদা উত্তর দিলেন। 'এখন সব খরচ তাদের। সব কাজ পি ডবলিউ ডি-র আণ্ডারে। তবে হ্যাঁ, সরকারকে পরে এ টাকা শোধ করতে হবে বৈকি! প্রতি টেস্ট ম্যাচের টাকা থেকেই সরকারকে কিছু কিছু করে শোধ দিতে হবে।' দূরে পশ্চিমের দিকে ফিরে কাল্যোদা দেখালেন, 'ওই যে নতুন নতুন ব্লক তৈরি হচ্ছে দর্শকের জন্যে, ওগুলোও অস্ট্রেলিয়া আসবার আগেই হয়ে যাবে। এটাও সরকারের হেফাজতে। খরচ তাদেরই? কাল্যোদা কথার ফেরে এবার একটু খোঁচা দিলেন, 'সরকারের সাহায্যে আমরা অনেক কিছুই তো করে যাচ্ছি, কভারড প্র্যাকটিসের জায়গা পেলে সারা বছরই তো ছেলেরা প্র্যাকটিস পেতে পারে। আর অজুহাত নয়, এবার একটু ছেলেরা খেলে দেখাক। তবেই তো সব পরিশ্রম, এত খরচ সার্থক হয়। তুমি কি বলো?'

আমি আর কি বলব! শুধু বললাম, 'সরকার আর সি এ বি-কে ধন্যবাদ। তারা যা করছেন তার তুলনা নেই। তবে ছেলেরাও নিরাশ করবে না। এইটাই আমার ধারণা।'



কার্টুন ঃ আলি

টি এফ এ-র নবনিযুক্ত সম্পাদক প্রশান্ত মজুমদারের লক্ষ্য আই এফ এ-র ঋণ মেটানো

আগরতলা থেকে অরুণাভ রায় ঃ

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধানে রয়েছে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে নতুন কার্যকরী কমিটি করতে হবে। কিন্তু হয়নি। শেষ পর্যন্ত ৯৭ দিন পরে এবছরের নতুন কার্যকরী কমিটি হল। অনেকেরই মনে একটি প্রশ্ন ছিল ; টি এফ এ-র দুর্দিনে কে হাল ধরবে। কারণ আর্থিক দিক থেকে অনেক ঋণ হয়ে আছে। টি এফ এ বর্তমানে ৪০ হাজার টাকার দেনার দায়ে ঝুলছে। এ দেনা হয়েছে গত বছর আমন্ত্রণমূলক পদ্মজং প্রতিযোগিতার সুবাদে। যাক, শেষ পর্যন্ত অনেক সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছেন ভেটারেন্স ক্লাবের সম্পাদক প্রশান্ত মজুমদার। প্রশান্তবাবু অবশ্য টি এফ এ-র সঙ্গে দীর্ঘ ১৮ বছর বিভিন্নভাবে জড়িত আছেন। তার মধ্যে ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ সালে যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৬৬ সালে সম্পাদক নিযুক্ত হলেও চাকুরির সুবাদে টি এফ এ পরিচালনা করতে পারেননি। সে বছর যুগ্ম সম্পাদক তাপস চৌধুরীকেই সম্পাদকের কাজ চালাতে হয়েছিল। টি এন দত্তর পরে প্রশান্ত বাবুই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় থেকে সম্পাদক হলেন। খেলোয়াড়ী জীবনে তিনি ত্রিপুরা একাদশের বেশ কয়েকবার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার মধ্যে ১৯৫৭ সালের আই এফ এ শিল্ড তার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রশান্তবাবু ত্রিপুরা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনেরও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাছাড়া স্থানীয় ঐতিহ্যশালী বীরেন্দ্র ক্লাবেরও সম্পাদক ছিলেন বেশ কয়েক বছর।



ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সম্পাদক প্রশান্ত মজুমদার / তাপস সেন

ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সমস্ত পরিকল্পনা নির্ভর করছে অ্যাসোসিয়েশনের দেনা মেটানোর উপর। বিশেষ করে গতবছর আমন্ত্রণমূলক পদ্মজং শিল্ড চালানোর সময় আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষ সিনক্রেয়ার কার্গো কোম্পানি মারফত ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স থেকে ২১,৭০০ টাকার বিমান টিকিট দিয়েছিলেন। সে টাকা এখনও দেওয়া হয়নি। আমার প্রথম লক্ষ্য অশোক ঘোষের টাকা শোধ করা।

যে সময়ে প্রশান্তবাবু টি এফ এর দায়িত্ব নিয়েছেন তখন দেনার সঙ্গে ছিল স্থানীয় লিগ নিয়ে একটা বিরাট জট। স্থানীয় লিগের ভণ্ডুল খেলা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ঐতিহাশালী পুলিশ দল প্রথম খেলার পর লিগে আর অংশগ্রহণ করেনি এবং আইন অনুযায়ী তাদের আগামী বছর 'বি ডিভিসনে' খেলতে হবে। পুলিশ দলের প্রশ্ন আসতেই তিনি বললেন, 'পুলিশ 'ডিসিপ্লিলিণ্ড ফোর্স' তাদের পক্ষে এটা ঠিক হয়নি। তাছাড়া এই পুলিশ দল স্থানীয় ফুটবলেই শুধু নয়, ত্রিপুরার বাইরেও তাদের নাম রয়েছে। এই পুলিশ দল ১৯৪৭ সালে আই এফ এ শিল্ডে মোহনবাগানের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল।' প্রশান্তবাবু আরও জানালেন, 'কোন বড় দলের কাছে মাথা নত করে থাকব না। দরকার হলে ক্লাবের সহযোগিতা না পেলে অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে দেব।'

এবারকার কার্যকরী কমিটি হয়েছে তিন বছরের জন্য। তাই দীর্ঘমেয়াদী কি কি পরিকল্পনা রয়েছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, '১৫ বছরের নীচে এবং মিনি পর্যায়ে দুটি আন্তঃমহকুমা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে। এবং তা থেকে বাছাই করে বছরে একবার আবাসিক কোচিং ক্যাম্পের পরিকল্পনা রয়েছে। এই দুটি আসরই ত্রিপুরার কোন জায়গায় করে পরে মূল প্রতিযোগিতা আগরতলায় করার ইচ্ছে।'

গ্রাম ত্রিপুরায় ফুটবলের প্রসারের ব্যাপারে তার মনোভাব জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আন্তঃমহকুমা ফুটবলের আসর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে কৈলাশহর মহকুমায় হচ্ছে। আন্তঃমহকুমা ফুটবলের আসর সব সময়েই মফঃস্বলে হবে। তাছাড়া আমন্ত্রণমূলক পদ্মজং-এর আসর আই এফ এ শিল্ডের মত ক্লাস্টার পর্যায়ে করার ইচ্ছে আছে। আরেকটা নতুন পরিকল্পনার কথাও তিন জানালেন। 'যদি মফঃস্বলের অ্যাসোসিয়েশনগুলি এগিয়ে আসে তাহলে ফেডারেশন কাপের মত অ্যাসোসিয়েশন কাপ চালু করার ইচ্ছে আছে। এতে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি এবং মফঃস্বলের অ্যাসোসিয়েশনগুলি আর্থিক দিক থেকে উপকৃত হবেন এবং গ্রামে-গঞ্জে খেলার প্রসার হবে।'

আসন্ন আমন্ত্রণমূলক পদ্মজং শিল্ডের ব্যাপারে তিনি কি ভাবছেন, জানতে চাইলে বললেন, 'কলকাতা থেকে প্রথম ডিভিসনের তিন চারটি দল আনব। প্রথম ডিভিসনের দল ছাড়া আনব না। আসাম এবং মণিপুর দলের উপর বেশী নির্ভর করব। ভারত সরকারের অনুমোদন পেলে বাংলাদেশের দু একটি দল আনার চেষ্টা করব।'

রেফারিদের মান উন্নয়নের প্রশ্নে আসতেই বললেন, 'ত্রিপুরা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কলকাতা থেকে একজন অভিজ্ঞ রেফারি এনে কম করে এক মাসের একটি আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা হচ্ছে। এতে সমস্ত ত্রিপুরা থেকে ৪০-৫০ জন রেফারি অংশগ্রহণ করবে। তিনি আরও জানালেন, মাঠে পুলিশি ব্যবস্থা আরও একটু ভাল হলে অনেক নতুন ছেলে এগিয়ে আসত, এ ব্যাপারে আমাদের পুলিশের সহযোগিতা দরকার।' রাজ্য দলের নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসতেই বললেন' 'এবার আমরা তিনজন অভিজ্ঞ লোককে পেয়েছি নির্বাচনী কমিটিতে। আশা করি সুবিচার পাবে খেলোয়াড়েরা। কমিটিতে রয়েছে অভিজ্ঞ রণজিত ভট্টাচার্য, বিমল রায় চৌধুরী এবং কমল সাহা। শেষোক্ত দুইজন এ রাজ্যে দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আর বিমল বাবু তো একজন এন আই এস প্রৈণ্ড।

প্রশান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলতে তিনি বার বার একটি কথাই বলছিলেন, 'আমার মাথায় এখন ঋণের বোঝা। সব কিছু নির্ভর করছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং-এর প্রদর্শনী ম্যাচের উপর। আর আমার সাফল্য তথা বিভিন্ন পরিকল্পনা নির্ভর করছে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সহযোগিতার উপর।'

চিঠিপত্র সংক্ষেপে, পরিষ্কার করে লিখুন। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবেন না। ব্যক্তিগত কোন সমালোচনা না করে গঠনমূলক আলোচনাই কাম্য। চিঠির ওপরে—'পাঠকের কলমে' কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

—সম্পাদক

এখন কি করছেন

সমীর ঘোষ ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বছরগুলিতে মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মেয়েদের আরও সাহসী হবার আবেদন জানাতেন। তারা নানাভাবে ভারতীয় মেয়েদের উৎসাহ দিতেন স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য। শক্ত সমর্থ বাণী ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ না করলেও মেয়েদের এগিয়ে আসার পথে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। বাণী ঘোষের বাবা মেজর দেবেশ চন্দ্র ঘোষ ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টারি কোর-এর ঘোড়সওয়ার সৈন্য বিভাগের কমাণ্ডার।

১৯২০ সালে বাণীর জন্ম। ছোটবেলা থেকে খেলাধূলার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ তাকে বিভিন্ন খেলাধূলায় ভবিষ্যতে পারদর্শীনী হতে সাহায্য করেছিল। এই ব্যাপারে বাণীর উৎসাহ যেমন ছিল, তেমনি ছিল দেবেশবাবুর অনুপ্রেরণা। বাড়ি ছিল কুমারটুলি অঞ্চলে। প্রতিদিন সকালে বাবার সঙ্গে গঙ্গায় সাঁতার কাটা ছিল দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে। সাঁতার ছাড়া লাঠি খেলা, ছুরি খেলা, দৌড়ানো, সাইকেল চড়া, ঘোড়ায় চড়া, রাইফেল ছোঁড়া প্রভৃতিতে যেমন পারদর্শীনী হয়ে উঠেছিলেন তেমনি নাচ, গান, কবিতা পাঠ প্রভৃতিতেও ছিল তার সমান দখল। সব কিছু মিলিয়ে বাণীকে তখন 'স্পোর্টস গার্ল' আখ্যা দেওয়া হত।

বাবার সঙ্গে একদিন গঙ্গায় সাঁতার কাটতে গিয়ে নজরে পড়েন বাংলার নামী সাঁতারু নলীন মল্লিকের। নলীনবাবুই বাণীকে সাঁতারের বিজ্ঞান-সম্মত পাঠ দেন। পরে বাংলার আর এক কীর্তিমান সাঁতারু প্রফুল্ল কুমার ঘোষের কাছেও ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৩২ সালে মাত্র বারো বছর বয়সে বাণী প্রথম প্রতিযোগিতামূলক আসরে নামেন। এই প্রতিযোগিতায় (অ্যাপোলো ক্লাব) ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৩ সালে গঙ্গায় সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় (আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব) পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ২৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে দশম স্থান ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব পরিচালিত প্রতিযোগিতায় ফ্রি স্টাইল, ব্যাকস্ট্রোক ও ব্রেস্টস্ট্রোকে পর পর তিন বছর প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি কয়েকজন পুরুষ সাঁতারুকেও হারান। ১৬ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার কেটেও তিনি এক নজীর স্থাপন করেন। ১৯৬৫ সালে বেঙ্গল ওলিম্পিকে অ্যাসোসিয়েশন তাকে 'চ্যাম্পিয়ন লেডি সুইমার অব বেঙ্গল' আখ্যা দেন সেরা প্রতিযোগিতায় ফ্রিস্টাইল, ব্রেস্টস্ট্রোক ও ব্যাক স্ট্রোকে পর পর তিন বছর সেরা নজীর গড়ার



বাণী ঘোষ তখন

সূত্রে। ভারতীয় ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনও তাকে স্বীকৃতি জানাতে ভোলেনি।

১৯৩৭ সালে পুরীতে তিনি এক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। জলজীবদের (নুলিয়া) সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বর্গদ্বার থেকে বি এন আর হোটেল পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রমে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কটকের মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্কে আরও একটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করতে তার সময় লেগেছিল তিন ঘণ্টা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানীয় সাঁতারুরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সাফল্যে তাকে চারটি সোনা ও ষোলটি রূপোর পদক দিয়ে কটকের জনসাধারণ সম্বর্ধনা জানান। এই সময়ে তিনি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মপুত্র নদও অতিক্রম করেন।

অল ইণ্ডিয়া ওলিম্পিয়া অ্যাসোসিয়েশন তাকে বার্লিনে একমাত্র ভারতীয় সাঁতারু হিসাবে ওলিম্পিক আসরে যোগদানের জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু আর্থিক কারণে বার্লিন যাত্রা বাতিল করা হয়। এই ঘটনায় তিনি বেশ হতাশ হন। কিন্তু ভেঙে না পড়ে তিনি ফ্রান্স যাওয়া মনস্থ করেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য, কোন রূপ সরকারী সাহায্য ছাড়াই। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে সেই সময়ে তাকে ও তার বাবাকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই স্বপ্ন সফল করার জন্য বিভিন্ন ভাবে টাকা তোলার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কলকাতা থেকে ফ্রান্সের পথে একটি সবুজ হার্ডসন গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তার বাবা ও প্রফুল্ল ঘোষ। কিন্তু বোম্বাই থেকে তাদের ফিরে আসতে হয়, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের জন্য। স্বাধীনতার পর তার এই স্বপ্ন সফল করেন আর এক বঙ্গতনয়া আরতি সাহা।

বিয়ের পর উন্মুক্ত কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেননি। এরপর থেকেই নানা ধরনের সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েন, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ সারদা মিশন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজও তার অটুট সম্পর্ক। বিভিন্ন ধরনের হবি আগে যেমন তার ছিল এখনও তেমনি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন জাতের কুকুর পোষা। তিনি বহু ট্রফিও জিতেছেন।

১৯৬৯ সালে স্বামী হরিশচন্দ্র বসু মারা যাওয়ার পর নিঃসন্তান বাণী আপেক্ষিক অর্থে একা হয়ে গেলেও আক্ষরিক অর্থে মোটেই একা নন। ভগবদ্‌চিন্তা, গাছপালার শখ ও সেতার তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে। গঠনমূলক চিন্তাধারা থেকে এখনও তিনি বিচ্যুত নন। স্বপ্ন ছিল ওলিম্পিকে অংশগ্রহণ করা, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা। সে স্বপ্ন নিজে সার্থক করতে না পারলেও তিনি মোটেই অখুশি নন। পরবর্তীকালের সাঁতারুদের সাফল্যে আজ তিনি গর্বিত। গঠনমূলক কাজ অর্থাৎ সাঁতারু গড়ার কাজে যদি কেউ তাকে আমন্ত্রণ জানান তাহলে সে আমন্ত্রণ তিনি নিশ্চয় গ্রহণ করবেন। কয়েক বছর আগে বিধান রায় স্মৃতি ফলক দিয়ে তাকে পশ্চিমবঙ্গ স্পোর্টস কাউন্সিল সম্বর্ধনা জানান। ●

কলকাতার মেয়েরা অ্যাথলেটিক্সে অংশ গ্রহণ করে না কেন ?

রাজশ্রী ভট্টাচার্য : আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, কলকাতার মেয়েরা মফঃস্বলের মেয়েদের তুলনায় অ্যাথলেটিক্সে অনেক পিছিয়ে আছে। যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত সকল প্রকার খেলাধূলার মূল উৎস এই অ্যাথলেটিক্স। এর অনুশীলন ছাড়া কোন প্রকার খেলাতেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এই সব খেলাধূলার প্রাণবস্তু স্বরূপ অ্যাথলেটিক্সের প্রচলন কিন্তু কলকাতায় তেমন নেই। যদিও একথা অনস্বীকার্য কলকাতায় বর্তমানে উপযুক্ত ট্রেনিং—প্রাপ্ত কোচের অভাব নেই এবং দুই একটি শিক্ষা-কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে, তবুও এসব শিক্ষাকেন্দ্রে কলকাতার মেয়েদের দেখা যায় না। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ভরে থাকে মফঃস্বলের মেয়ে-দের নিয়ে। এটা খুব দুঃখের এবং লজ্জারও বটে। অথচ কত দূর দূর গ্রাম থেকে মেয়েরা উৎসাহভরা বুকে নিয়মিত কলকাতায় অনুশীলন করতে আসে ট্রেনে, বাসে। অসম্ভব ভিড়ের মাঝেও তারা তাদের উদ্দীপনা হারায় না। আশাভরা মনে তারা হাসিমুখে এসব যাতনা সহ্য করে নেয়। কখনও তাদের নিরুৎসাহ হতে দেখা যায় না। উৎসাহ পায় তারা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকেও, এইসব দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের মা বাবা'রা তাদের মেয়েদের নিয়ে কত আশা করেন, গর্ব অনুভব করেন। তারই ফলস্বরূপ আজ পর্যন্ত জাতীয় আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগি-



অ্যাথলেটিক্সে বাংলার গর্ব রীতা সেন

তায় যে কটি পদক বাঙালী মেয়েরা অর্জন করেছে তার অধিকাংশই এসেছে কলকাতার বাইরের মেয়েদের কাছ থেকে যেমন অণিমা ব্রহ্ম ও সিদ্ধেশ্বরী হালদার দক্ষিণ বারাসতের মেয়ে, বোড়ালের মেয়ে শ্রীরূপা চ্যাটার্জি, সুব্রতা দেবনাথ বালির মেয়ে।



দক্ষিণ বারাসাতের অণিমা ব্রহ্ম জাতীয় দলে স্থান করে নিয়েছে

আর কলকাতার মেয়েরা ? তাদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র উল্লেখযোগ্য নাম, রীতা সেন। কলকাতার মেয়েদের অ্যাথলেটিক্সের মাঠ থেকে দূরে সরে থাকার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ নিহিত আছে। এসব কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়। কলকাতার মেয়েদের গৃহ পরিবেশ ক্রীড়া-ক্ষেত্রের প্রতিকূল। অধিকাংশ অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের ধারণা মেয়েদের এসব শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠালে তারা বর্হিমুখী হয়ে যাবে এবং তাদের পড়াশুনারও বিশেষ ক্ষতি হবে এবং গৃহ কর্মে অনুপোযুক্তা হয়ে পড়বে। ফলে ভবিষ্যতে সংসার জীবনে তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। যদিও এ ধারণা নিতান্তই ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পৃথিবীতে যে সব জাত শিক্ষিত ও উন্নত বলে পরিচিত, তাদের দেশ থেকে অসংখ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এই অ্যাথ-লেটিক্সের ক্ষেত্রে যশ অর্জন করে যাচ্ছে।

অথচ ভারতবর্ষে কলকাতার মত উন্নত শহরে বসবাস করেও তারা তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারছে না এটা নিতান্তই লজ্জার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইসব অভিভাবকগণই সময় সময় আমাদের দেশের মেয়ে খেলো-য়াড়দের নিম্নমানের কথা তুলে সমালোচনায় লিপ্ত থাকেন এবং খেলোয়াড়দের অনুপোযুক্ত-তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশে প্রহসন করেন এবং নিন্দাসূচক বাক্যও ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই সকল অভিভাবক কি একবারও চিন্তা করে দেখেছেন, যে আমাদের দেশের মেয়েদের খেলাধূলার অন্তরায় তারা নিজেরাই। একবারও কি পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাদের মেয়েদের মধ্যেই এ প্রতিভা লুকোনো আছে কিনা ? এত উন্নত শহরেও অভিভাবকদের এই রক্ষণশীল মনোভাব বড়ই বেমানান। কিন্তু মফঃস্বলের অভিভাবকগণ এসব ভ্রান্ত ধারণার কবল থেকে সম্পূর্ণ-মুক্ত। যদিও তারা শহরের অভিভাবকদের থেকে শিক্ষাগত আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা নিম্নমানের। তবুও তারা তাদের মেয়েদের খেলাধূলায় উৎসাহিত করতে কার্পণ্য করেন না। এই সব অভিভাবকের কাছ থেকে কলকাতার অভিভাবকদের নিজেদের তথাকথিত সম্ভ্রম ত্যাগ করে বোধহয় কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

কলকাতার স্কুলগুলোও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়। কলকাতায় যে কোন মেয়েরই স্কুল



বোড়ালের মেয়ে শ্রীরূপা চ্যাটার্জি রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে বড় নাম/অরুণ মুখার্জি



দক্ষিণ বারাসাতের আরেক মেয়ে সিদ্ধেশ্বরী হালদার/পাতালী

থেকে বাড়ি ফিরতে পাঁচটা বেজে যায় কারও আবার আরো দেরি হয়। কাজেই তখন তাদের পক্ষে আর অ্যাথলেটিক্স অনুশীলন করতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাও যদি ঘরের কাছে কোন শিক্ষাকেন্দ্র থাকতো! তারও একান্ত অভাব। অনুশীলন করতে হলে তাদের যেতে হবে গড়ের মাঠে কিংবা রবীন্দ্র সরোবরে। এতসব করে তারা এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে থাকে তার উপর যদি অ্যাথলেটিক্সের মত সূক্ষ্ম ও পরিশ্রমের খেলা অনুশীলন করে তবে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাস্তবিকই তাদের পড়াশুনা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে স্কুল-গুলোরই উচিত নয় কি মেয়েদের স্কুলে এই অ্যাথলেটিক্সের অনুশীলন করানো? যেখানে আমাদের প্রতিটি স্কুলেই একজন করে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিকা আছেন এবং শিক্ষাবিদগণ খেলাধুলাকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন তবুও এ ব্যাপারে স্কুলগুলো যে কেন এত উদাসীন বোঝা যায় না? ছাত্রীরা শিক্ষিকাদের কাছ থেকেই কম উৎসাহ পায়। আবার অনেক সময় শিক্ষিকাগণ মেয়েদের রোজকার পড়াশুনায় একটু অবহেলা দেখলে খেলার মাঠের কথা তুলে নিন্দাসূচক বাক্য বর্ষণ করেন। খেলাধূলা যে শিক্ষার একটা অঙ্গ একথা জেনেও মেয়েদের যথেষ্ট পরিমাণে নিরুৎসাহ করে দেন। ফলে অনেক মেয়ে খেলাধূলার ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হয়েও মাঝপথে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় স্কুল কর্তৃপক্ষ অ্যাথলেটিক্সের অনুশীলন না করিয়ে একটা মাত্র বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেই তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করেন।

এছাড়াও নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কলকাতার মেয়েদের। অ্যাথলেটিক্সের আসল ...স দম তৈরি করার মত জায়গা কলকাতায় কোথায়? এর জন্য প্রয়োজন মাইলের পর মাইল দৌড়নোর। কিন্তু সে সুযোগ কলকাতার মেয়েরা একদমই পায় না। তাদের দৌড়নোর মত ফাঁকা মাঠ বলতে একমাত্র বোঝায় গড়ের মাঠ কিন্তু এই গড়ের মাঠের পরিবেশ মেয়েদের দৌড়নোর উপযুক্ত নয়। তবুও যেসব মেয়ে এর মধ্যেও দম তৈরি করে তারাও আবার কল-কাতার এই দূষিত আবহাওয়ার ফলে নিয়মিত তার কিছুটা অংশ নষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু গ্রাম বা মফঃস্বলের মেয়েদের এ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। তাদের দৌড়নোর মাঠেরও অভাব নেই—অভাব নেই বিশুদ্ধ ও মুক্ত বায়ুর।

এছাড়া গ্রামের তুলনায় শহরের মানুষের মধ্যে শিল্পকলা চর্চার প্রবণতা চিরকালই দেখা যায়। এবং এই সব শিল্পকলা চর্চার শিক্ষা-কেন্দ্র কলকাতার অলিতে গলিতে। তারই ফলস্বরূপ কলকাতার মেয়েরা শিল্প চর্চার দিকে অধিক মনোযোগী হয়ে থাকে। এতে পরিশ্রমও তুলনামূলকভাবে খেলাধূলার থেকে অনেক কম। তারা গান, নাট্যাভিনয়, অঙ্কন ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদের ব্যস্ত রাখে বলেই খেলাধূলার প্রচলনটা স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্য জাগে না। কিন্তু শরীর চর্চা না করলে কোন কিছুতেই সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। ইংরাজিতে একটা প্রবাদবাক্য আছে—A sound mind in a sound body তাই এ ব্যাপারে উদাসীন থাকার ফল ভাল হতে পারে না। এ পরিবেশ জাতি গঠনে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠে একথা সম্ভবত আমাদের দেশের কর্ণধারগণও বুঝতে চেষ্টা করেন না। এ পরিস্থিতি ক্রমাগত চলতে থাকলে আমাদের দেশের খেলাধূলার মান আরও নেমে যেতে বাধ্য।

সবাই এখন ক্লান্ত

মণিকা নাথ

ক্লান্ত আমি,
ক্লান্ত তুমি
আর ক্লান্ত 'পাঁচুদা'।
ক্লান্ত সাব্বির
ক্লান্ত মানস।
ক্লান্ত মোদের 'দ্বিজুদা',
'ফুটবলার' আর 'অষ্টাবক্র'
ওরাও এখন ক্লান্ত,
'ব্যাসদেব' আর
স্টাফ রিপোর্টার
সবাই এখন শ্রান্ত।
শূন্য মাঠে
শূন্য ঘাটে
ওরাও নাকি ক্লান্ত।
(কিন্তু) খেলার আসর
নিচ্ছে রেস্ট ;
এ ধারনাটা ভ্রান্ত।



যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টেনিসের দুই চ্যাম্পিয়ন ট্রেসি অস্টিন ও জন ম্যাকেনরো

স্মুব্রত সরকার : ট্রেসি অস্টিন আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার মেয়ে। জন ম্যাকেনরো'র বাড়ি নিউইয়র্ক স্টেটে, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব দিকে। এরা দুজনেই বিশ্ব টেনিসের নজরে প্রথম আসে দু'বছর আগের শতবার্ষিকী উইম্বলডন প্রতিযোগিতায়। আর নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং মেডোস অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এবারকার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতায় এরাই দু'জন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন।

শেষ ত্রিশ বছর ম্যাকেনরো'র মতন এত অল্প বয়সে কোন প্লেয়ার আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন হয়নি। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তার বয়স মাত্র ২১ পূর্ণ হবে। তবে তার তুলনায় ট্রেসি তো আরও ছেলেমানুষ। সামনের ডিসেম্বর মাসে তার বয়স সবে ১৭ পূর্ণ হবে। এবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে যে মেয়েটি বালিকাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী হল তার বয়স ট্রেসির থেকে বেশি।

ম্যাকেনরো ন্যাটা প্লেয়ার, তার খেলা প্রধানত সার্ভ-ভলির উপর, তার বদনাম আছে বদমেজাজি বলে। ট্রেসি খেলে ডান হাতে : মূলতঃ সে বেসলাইন প্লেয়ার, আর কোর্টে তার ব্যবহার চলাফেরা প্রায় ক্রিস এভার্ট লয়েডের মতনই শান্ত। ম্যাকেনরো যে বর্গ, কনর্স প্রমুখ প্লেয়ারদের হারাতে পারে এটা অনেকেই মনে করেছিলেন : কিন্তু এবার উইম্বলডন ম্যাকেনরো চতুর্থ রাউণ্ডে অকস্মাৎ স্ট্রেট সেটে হেরে বসল টিম গালিকসনের কাছে। অন্যদিকে ট্রেসি অস্টিন যে আপাতত ক্রিস লয়েড বা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভাকে হারাতে পারবে না, এই ছিল বিশেষজ্ঞদের মতামত। উইম্বলডনের সেমিফাইনালে মার্টিনার সম্মুখীন হয়ে ট্রেসি সে কথাই সত্য প্রমাণ করেছিল।



ট্রেসি অস্টিন

কিন্তু ফ্লাশিং মেডোসের ঘটনা—এক অন্য কাহিনী। ট্রেসি ফাইনালে হারিয়ে ফেলল ক্রিস লয়েডকে। আরেকজন বেসলাইনার : তবে তাদের খেলায় ট্রেসি কনসিস্টেনসি ছিল উন্নত, ক্রিস যেন তার আগের মতন মনযোগ দিয়ে খেলতে পারছে না। তবে ট্রেসির আরও বড় জয় হয়েছিল সেমিফাইনালে, মার্টিনাকে হারিয়ে।

ম্যাকেনরো চ্যাম্পিয়ন হল ভিটাস জেরুলাইটাসকে হারিয়ে। তার আগে সেমিফাইনালে জিমি কনর্স পরাজিত হয়েছিল ম্যাকেনরো'র কাছে। ম্যাকেনরো গত জানুয়ারিতে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনসে কলগেট মাস্টার্স প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিল ; তারপর মে মাসে ডালাসে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টেনিস সিরিজের ফাইনাল জেতে। তবে এ'দুটি ছিল আটজনের প্লে-অফ : উইম্বলডন, ফ্রেঞ্চ ওপেন বা যুক্তরাষ্ট্র চ্যাম্পিয়নশিপের মতন ১২৮ খেলোয়াড়ের প্রতিযোগিতা নয়। দু'টির মধ্যে তফাৎ অনেক। তাছাড়া এ টি পি-র কম্পিউটার হিসাবে তো প্লে-অফ কম্পিটিশন প্রভৃতি গণ্য করাই হয় না।

ম্যাকেনরো'র জন্ম পশ্চিম জার্মানিতে। জেরুলাইটাসের মতন অল্প বয়সে তার কোচও ছিলেন সেই বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান হ্যারি হপম্যান। শতবার্ষিকী উইম্বলডনের সময় প্রাথমিক পর্যায়ে খেলা থেকে মূল প্রতিযোগিতায় উঠে সেমিফাইনাল অবধি পৌঁছেছিল। সেখানে হার কনর্সের কাছে। আঠার বছর বয়সে ম্যাকেনরো কনিষ্ঠতম উইম্বলডন সেমিফাইনালিস্ট।

ম্যাকেনরো'র খেলা দেখে তেমন অসাধারণ কিছু মনে হয় না। বর্গের যেমন ফোরহ্যাণ্ড টপস্পিন, ট্যানারের সার্ভিস কনর্সের রিটার্ন সার্ভ বা রোজওয়ালের ব্যাকহ্যাণ্ডের মতন ম্যাকেনরো'র কোন বিশেষ শক্তি চট করে চোখে পড়ে না। এবার উইম্বলডনের সপ্তাহ



দুই আগে লণ্ডনের কুইনস ক্লাবে ম্যাকেনরো আমাদের বিজয় অমৃতরাজকে হারায়। ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য একদিন পরে হয়। নির্ধারিত দিনে বিজয়কে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জিততে পারবে বলে তার মনে হয় কিনা।

বিজয় উত্তর দিয়েছিল: 'হি ইস দ্য ওনলি প্লেয়ার এগেনস্ট হুম আই ফিল হেল্পলেস!' বিশ্লেষণ করে বলেছিল, ম্যাকেনরো'র যেমন কোন মার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় নয়, তার খেলায় দুর্বলতাও নেই বললেই চলে। উপরন্তু সে নেটের কাছে খুব চটপটে, আর ওর সার্ভিস তেমন জোর না হলেও তাতে বৈচিত্র্য অনেক। 'আই কাণ্ট হ্যাণ্ডল হিস সার্ভ' বিজয় বলেছিল। ম্যাকেনরো'র নাকি একই ভঙ্গিতে তিন রকম সার্ভ আছে: একটি বিপক্ষ প্লেয়ারের ফোরহ্যাণ্ডে যায়, আরেকটি তার ব্যাকহ্যাণ্ডে যায়, আর তৃতীয়টি সুইং করে প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীরের দিকে যায়।

ম্যাকেনরো যে শীঘ্রই একটা বড় টুর্নামেন্ট জিতবে, কয়েক মাসের মধ্যে যে তার অ্যাভারেজ রেকর্ড বর্গ বা কনর্সের চেয়ে ভাল হবে, একথা অনেকেই বলে আসছেন। তবে সবাইকে অবাক করল ট্রেসি অস্টিন। মানা হয়েছিল, মেয়েটি ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন। তবে ধরে নেওয়া হয়েছিল সেই মানে পৌঁছাতে তার আরও বছর দুই/তিন লাগবে। উইম্বলডনে ট্রেসি তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেতো ট্রেসি ওই দুই/তিন বছরকে এক লাফে টপকে ফেলল।

উত্তরবঙ্গের ডায়েরি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রায়গঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত তেরোটি স্থানীয় দলের এবছরের ফুটবল লিগ শেষ হয়েছে। মাঝ পথে কিছুদিন অস্বাভাবিক কিছু কারণে বন্ধ থাকবার পর উৎসাহী কিছু ক্রীড়ামোদীর শুভ প্রচেষ্টায় আবার তার পুনরনুষ্ঠান চলে এবং সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি হয়।

বারোটি খেলায় যোগ দিয়ে তেইশ পয়েন্ট অর্জন করে রায়গঞ্জ স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের অনন্য সম্মান অর্জন করেছে। রানার্স হয়েছে বাইশ পয়েন্ট পেয়ে সংঘশ্রী ক্লাব। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কুলদাকান্ত স্মৃতি শিল্ড এবং তারাপদ রানার্সআপ কাপের খেলা শুরু হবে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

রায়গঞ্জে রাজ্য টেবল টেনিস

১২ অক্টোবর থেকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় রায়গঞ্জ স্টেডিয়াম মাঠে পঁয়তাল্লিশতম রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এই খেলার জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকা। খেলা চালানোর জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার সভাপতি হয়েছেন আর শিবশৈলম, কার্যকরী সভাপতি মহকুমা শাসক শের সিং, সম্পাদক এস কে দাস এবং কোষাধ্যক্ষ বি বি বৈশ্য।

শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ পরিচালিত উত্তরবঙ্গ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সায়গল ইনস্টিটিউট (শিলিগুড়ি) এবং রানার্স রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যাণ্ট। জুনিয়র বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির সায়গল ইনস্টিটিউট এবং রানার্স দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন। পুরুষ সিঙ্গলসে কলকাতার দেবীদাস বসু হুগলীর দেবাশীষ সাহাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং জুনিয়র সিঙ্গলসে হুগলীর দেবাশীষ সাহা সায়গলের বিশ্বজিত ঘোষকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

মহিলাদের সিঙ্গলসে হুগলীর দীপ্তিকণা দে কলকাতার করবী ঘোষকে হারিয়ে এবং সাব-জুনিয়র বিভাগে শিলিগুড়ির গণেশ কুণ্ডু শিলিগুড়িরই চন্দন দাসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। পুরুষদের ডাবলসে শিলিগুড়ির সঞ্জয় দে এবং প্রসূন অধিকারীর জুটি শ্যামল দাস এবং সঞ্জীব সোমের জুটিকে হারায়।

এই প্রতিযোগিতায় রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যাণ্ট, কলকাতা, হুগলী এবং শিলিগুড়ি থেকে মোট একশো কুড়িজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গবাসীদের পক্ষে সুখবর হল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন কাপে এবারের পশ্চিমবঙ্গ পুরুষ দলে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য যে চারজন গিয়েছিল তারা হল সঞ্জয় দে, শ্যামল দাস, প্রসূন অধিকারী এবং সঞ্জীব সোম।

প্রমোদ দাশগুপ্ত অ্যালবাম খুলে স্মৃতিতে ডুব দিতে ভালোবাসেন

সন্দীপ দত্তঃ ১৯৩৫-এ একঝাঁক ডাকসাইটে খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গল লিগ মরশুম শুরু করে তার আগের বছরের লিগে ব্যর্থতার গ্লানি ভোলার চেষ্টায়। শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ে লিগে রানার্স হল। আসলে দলে সকলেই প্রায় সমান দরের খেলোয়াড়। ফলে দল গঠনের সময় মুস্কিল দেখা দিত কাকে বসিয়ে কাকে নামানো যায়। যা'হোক, দল রানার্স হলেও গত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় একটি ব্যাপারে কর্মকর্তাদের চোখ খুলে গিয়েছিল। তা হল, ময়দানের আনাচে কানাচে বেড়ে ওঠা টগবগে খেলোয়াড়দের খোঁজ রাখা। বছর ঘুরতেই নির্ভরযোগ্য হাফব্যাক নুরমহম্মদ দল ছেড়ে গেলেন। তাছাড়া ডিপ ডিফেন্সের দুই খেলোয়াড় রসিদ ও সেলিমের দক্ষতায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছিল।

সে সময় দ্বিতীয় ডিভিসন লিগে ভবানীপুর ক্লাবের রাইট ব্যাকের জায়গায় ছোটখাটো চেহারার বছর ১৮ বয়সের একটি ছেলে চুটিয়ে খেলে সকলের নজর কেড়েছিল। অতএব রসিদ ও সেলিমের জায়গা পূরণ করার জন্য ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ ওর কথাই ভাবলেন। এবং জলদি ক্ষুদে ফুটবলারটিকে নিজেদের তাঁবুতে টেনে নিয়ে তবে চিন্তা মুক্ত হলেন। সেই থেকে টানা ১৪ বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সুখদুঃখের অংশীদার এবং ভারতের জার্সি গায়ে বিদেশ সফর ও ইউরোপীয়ান দলের বিরুদ্ধে দাপটে খেলে যাওয়া এই ফুটবলারের নাম প্রমোদ দাশগুপ্ত—কালের ধারায় অতীতের আরও অনেক নামী-দামী খেলোয়াড়ের মত যার নাম আজকের দিনের অনেকের কাছেই অপরিচিত।

১৯১৪ সালে কুমিল্লা শহরের এক সচ্ছল পরিবারে জন্ম প্রমোদ দাশগুপ্তর। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের কেউ মাঠের ধারে-কাছে যেতেন না। অথচ ছোট থেকে প্রমোদের খেলাধুলোর প্রতি দারুণ টান। বাড়ির ছোটছেলের এই 'বিজাতীয় খেলা-প্রীতি'বাড়ির অন্যরা বিশেষ সুনজরে না দেখলেও বাবা ডাক্তার যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রশ্রয়ে প্রমোদ আরও বেশী ঝুঁকে পড়লেন খেলার দিকে। প্রথমে বড় অ্যাথলিট হবার বাসনা নিয়ে মাঠে নামলেন। পড়তেন কুমিল্লা জেলা স্কুলে। প্রতিবারই স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসের শেষে ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড় এবং লং জাম্পে চৌকস প্রমোদ বাড়ি ফিরতেন একগাদা প্রাইজ নিয়ে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ফুটবলের চর্চাও চলত। খেলতেন কুমিল্লা ইয়ং মেনস স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবে। অ্যাথলেটিক্স ও ফুটবলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার নাম ছড়িয়ে পড়ল আশে-পাশে। অতএব পড়াশোনা শিকেয় তুলে দিনরাত এখানে সেখানে খেলে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু স্কুলের নিয়ম কানুন ছিল দারুণ কড়া। বার্ষিক পরীক্ষায় একের বেশী বিষয়ে ফেল করলে স্কুল থেকে নাম কাটা যেত। সেকালে খেলাধূলার জন্য প্লেয়াররা তেমন করে কোন সুবিধা পেত না।

মুস্কিল কিছুটা আসান হল। খেলার ঘোরে মত্ত প্রমোদ স্কুল বদল করে ভিক্টোরিয়া স্কুলে চলে গেলেন বিশেষ সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি পাওয়া মাত্রই। সেই সময়ই কলকাতার ভবানীপুর ক্লাবের খেলোয়াড় কুমিল্লার ছেলে ভোলা বর্দ্ধণ দেশে ফিরে প্রমোদের খেলা দেখে তাকে ভবানীপুরে যোগ দেওয়ার কথা বললেন। কুমিল্লারই বেশ কিছু কৃতী খেলোয়াড় তখন কলকাতার মাঠে সুনামের সঙ্গে খেলত। তাছাড়া কলকাতায় খেলার একটা আলাদা আকর্ষণও ছিল। ছোট থেকেই বেপরোয়া প্রমোদ এণ্ট্রাস পরীক্ষার পড়াশোনা ছেড়ে একদিন ভোলা বর্দ্ধণের সঙ্গে কলকাতায় পাড়ি দিলেন।

একটানা এতক্ষণ স্মৃতির ঝাঁপি হাতড়ে পুরনো দিনের কথা বলতে গিয়ে বার বার থেমে যাচ্ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্মরণশক্তিতেও ঘাটতি পড়ে গেছে অনেকখানি। তবু একটু চিন্তা করেই অবশ্য তিনি ফের পরবর্তী ঘটনায় ফিরে এলেন। বললেন—'ভবানীপুর ক্লাবের হয়ে কলকাতার মাঠে প্রথম খেলতে নামার কোন প্রতিক্রিয়া আমার মনে চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। যা হোক, তারই মাঝে দেশে ফিরে এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসলাম। তৈরি ছিলাম না। সুতরাং যথারীতি ফেল করলাম। পরের বারের জন্য সিরিয়াসলি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপুরের রাইট ব্যাকের দায়িত্ব পালন করে গেলাম যথাযথভাবে। ইতিমধ্যে এক সময়



কুমিল্লায় ফিরে আবার পরীক্ষা দিলাম এবং ভালভাবে পাসও করলাম। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলার সাধ ছিল অনেকদিন থেকেই। সুতরাং ডাক পেতেই তৎকালীন ক্লাব সম্পাদক বনোয়ারি লাল রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম এবং ঝটপট সই করার পাটও চুকে গেল। বনোয়ারিবাবুর শোভাবাজারের বাড়িতে তখন ক্লাবের অনেক খেলোয়াড় থাকতো এবং খাওয়া দাওয়া করতো। আমাকে সেখানে থাকার কথা বলা হল। আমি অবশ্য থাকতাম মির্জাপুরে দিদির বাড়িতে।

সে বছর ইস্টবেঙ্গলের প্রথম খেলা পড়েছিল ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে। তখন সামাদের মত বড় খেলোয়াড়-সমৃদ্ধ রেল দলকে সবাই সমীহ করত। যাইহোক, রাইট ব্যাক হিসেবে আমার দায়িত্ব পড়ল সামাদকে সামাল দেওয়ার। মাঠে নামার আগে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সামাদকে চিনিয়ে দিলেন। সামাদের দারুণ দারুণ সব কীর্তিকলাপের

কথা সম্পর্কেও উপদেশ দিলেন কেউ কেউ। খেলা শুরু হতেই আমি সামাদের পিছনে আঁঠালি পোকার মত লেগে রইলাম। আমার বড় মূলধন গতি। তাকে কাজে লাগিয়ে সামাদকে অকেজো করে দেওয়ায় এক সময় সামাদ রেগে গিয়ে আমাকে একপ্রস্থ গালিগালাজ করলেন। শেষ পর্যন্ত সেই খেলাতেই সামাদ একটি কঠিন ভলি মারতে গিয়ে তা ফস্কালেন এবং পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে গেল। লিগে ইস্টবেঙ্গল সেবার মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য অষ্টম স্থান পেল। সেবছর জুনিয়র ইন্টারন্যাশনাল খেলার পর সিটি (মেনরাও) কলেজে পড়ার সুবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল খেলতে গেলাম পাটনায়। সেখানে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় দলে আমারই মত লম্বা (৫ ফুট) রাখাল মজুমদার দারুণ খেলল। সুতরাং ফিরে আসার সময় রাখালকে তুলে নিয়ে এলাম আমাদের ক্লাবে খেলার জন্য। পরের বছর পরেশ মজুমদারের ক্যাপ্টেন্সিতে আমরা আবার লিগে রানার্স হলাম। এছাড়া আমি বার্মা সফরেও হাজির ছিলাম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে। ৩৮ থেকে ৪০ সাল পর্যন্ত টানা তিন বছর অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ছিল আমার কাঁধে। এর মধ্যে প্রথম বছরটি আমার কাছে স্মরণীয়। কারণ একই বছরে ইউরোপীয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলা ছাড়াও করুণা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে আমিও ভারতীয় দলে ঠাঁই পেয়েছিলাম।

সেখানে গিয়ে দারুণ মজা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ানরা আমাদের খালি পায়ে মাঠে নামতে দেখে তো ভীষণ অবাক। আমাদের খালি পায়ের ছবি তুলতে ফটোগ্রাফারদের মধ্যেও হুড়োহুড়ি লেগে গেল। এক কথায় খালি পায়ে ফুটবল খেলা যায়—এটা ওরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

লিগ বা শিল্ডে আমরা বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। তবে দ্বিতীয় বছরে ভারতীয় একাদশের হয়ে ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে খেলেছি।'

শেষ আট বছরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমস্ত সাফল্যের অন্যতম ভাগীদার ছিলেন প্রমোদবাবু। যার মধ্যে '৪২-এ প্রথম লিগ জয় এবং'৪৫-এ একই সঙ্গে লিগ ও শিল্ড জয়ের কথা কোন দিনই ভোলা সম্ভব নয়।

কলকাতা ময়দানের সাম্প্রতিক চেহারা সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই প্রমোদবাবু বললেন—একথা ঠিক যে, আমাদের সময় দর্শকরা ছিলেন অনেক ভদ্র। ক্লাবের প্রতি তাদের ভালোবাসাও কোন অংশেই কম ছিল না। তবে মাঠের পরিবেশ এতটা গরম হয়ে উঠত না যখন তখন। খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল দারুণ। যেমন মোহনবাগান সমর্থকরা আমাকে 'কেলে পাঁঠা' বলে খেপাতো। গায়ের রং নিয়ে এধরনের ঠাট্টায় রাগ হত ঠিকই, তবে কখনও ধৈর্য সীমা ছাড়ায়নি। তবে মাঝে মধ্যে দু'একটা তিক্ত ঘটনা যে ঘটত না এমন নয়। যেমন ১৯৪৫-এ শিল্ড ফাইনালে প্রথম মুখোমুখি হল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। তার ওপর সেবার ইস্টবেঙ্গল লিগ পেয়েছিল এই মোহনবাগানকেই ২-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে। সুতরাং দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে সে খেলার আকর্ষণ ছিল প্রচণ্ড। চারিদিকে 'টিকিট চাই, টিকিট চাই' রব। প্রত্যেকেই মাঠে হাজির থেকে প্রিয় দলের খেলা চাক্ষুষ করতে চায়।' দলের অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেকেও তৈরি করেছিলেন প্রমোদবাবু। কিন্তু মর্যাদার লড়াইয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত শেষ পর্যন্ত খেলতে পারলেন না। কারণ আগের দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কয়েকজন অপরিচিত লোকের হাতের হকি স্টিক ঝলসে উঠল প্রমোদ দাশগুপ্তের মাথায়। যার ফলে খেলার দিন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সাইড লাইনের বাইরে বসে হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। অবশ্য পাগসূলের দেওয়া গোলে ইস্টবেঙ্গল সেবার ম্যাচ জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

সেদিন দলের সাফল্যে আনন্দ হলেও নিজে খেলতে না পারার দুঃখ আজও তার মনকে নাড়া দেয়। অবশ্য ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠা প্রমোদ দাশগুপ্ত বুট পরা গোরাদের সমীহ আদায় করতে ছাড়েননি। তিনি খেলা ছেড়ে দিলেন ৪৮ সালে।

প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিলেন '৩৯ সালে। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে। খেলায় অসুবিধা হচ্ছিল বলে পরে অ্যালবার্ট ডেভিড ওষুধ কোম্পানীতে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকে অবসর নিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। ৬৫ বছরের প্রমোদবাবু থাকেন বালিগঞ্জ ফার্ণ রোডের ভাড়া বাড়িতে। খেলোয়াড় জীবনে হবি ছিল ছবি তোলা এবং অ্যালবাম করা। যেখানেই যেতেন ক্যামেরা থাকত সঙ্গে। এখন অবসর সময়ে মাঝে মাঝে অ্যালবামের ছবিগুলোর মধ্যে হারিয়ে যেতে ভালবাসেন। এছাড়া ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে বিকেলের দিকে অবশ্যই মাঠে যাওয়া চাই। তা না হলে সমসাময়িক পুরনো খ্যাতনামা খেলুড়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন নিয়মিত। আজকালকার খেলা সম্পর্কে জানালেন—'এখনকার খেলার ধরন অনেক ভাল। তবে এরকম খেলায় যতটা শারীরিক সক্ষমতা দরকার ততটা কোন খেলোয়াড়ের নেই।

ছবি : শঙ্কর নাগ দাস

হুগলী জেলা ফুটবল লিগ পেল বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ঠিক তিন বছর পরেই ওরা আবার লিগ জয় করলো। হুগলী জেলা ফুটবল লিগে বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবের সাফল্যটা যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। তিন বছর পর পর ওরা লিগ জয় করবেই। ওরা জিতেছে ছিয়াত্তরে, তিয়াত্তরে। তার তিন বছর আগে সত্তরে, আবার সাতষট্টিতেও। তবে এবারের জয়টা ওদের বেশী আনন্দ দিয়েছে। আগামী বছর যে ক্লাবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব হবে, সেই মুহূর্তে এই জয় প্রস্তুতির উৎসাহকে বাড়িয়ে দিল।

হুগলী জেলা ফুটবলে চুঁচুড়ার বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবের অবদান কম নয়। এই ক্লাবেই অতীত দিনের বহু নামকরা খেলোয়াড় খেলেছেন। অচ্যুত মুখার্জি, হরিদাস কুণ্ডু এরা সব এই ক্লাবেরই। বর্তমানে সুরজিৎ সেনগুপ্তর যে নাম ডাক তারও ফুটবল জীবন শুরু এই বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবেই। এখনও সুরজিৎ সময় পেলে ক্লাবের খেলার দিন চুঁচুড়া মাঠে চলে যায়। সুরজিতের আমলে সত্তরে বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাব চুঁচুড়ার সব ট্রফিই জয় করে-ছিল।

ওরা পনেরটি খেলে ঊনত্রিশ পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদেই লিগ বিজয়ী বলে ঘোষিত হয়ে যায়। ওরা পুলিশকে ২-০ গোলে, জেলাশাসক একাদশকে ৩-০ গোলে, সাহাগঞ্জকে ২-১ গোলে, মহসীন ইনস্টিটিউটকে ১-০ গোলে, ইউনিয়ন এ সি'কে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। শুধু বাঁশবেড়িয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা শেষ করে এক পয়েন্ট খুইয়েছে। বাঁশবেড়িয়াই ছিল গত বছরের বিজয়ী। আর উডরার্ণের সঙ্গে ভণ্ডুল খেলাটির রায় ওদের স্বপক্ষে যাওয়ায় ওরা দু'পয়েন্ট পেয়ে যায়।

বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবে এবার খেলেছিল ঃ গণেশ মুখার্জি, দীপক সেন, দীপক চ্যাটার্জি, চন্দন গাঙ্গুলী, প্রভাস ঘোষ, সত্যজিৎ ঘোষ, (অধিনায়ক) কার্তিক চক্রবর্তী, আনন্দ মুখার্জি, কমল ঘোষ, নিমাই রাজবংশী, দীপক মজুমদার, নলিনাক্ষ রায়চৌধুরী, তাপস দে, কৃষ্ণকান্ত পুল্ল, অমিত রায়, পুলিন প্রামাণিক, অমর দাস, চন্দন রায়, অরবিন্দ ঘোষ। এদের মধ্যে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা দীপক মজুম-দার। এছাড়া ওদের তাপস দে'ও একটি খেলায় হ্যাটট্রিক করে। দলের কোচ ছিলেন দীপক চ্যাটার্জি।

বিনামূল্যে সারাজীবন

খেলার আসর

পড়ুন

আপনি কি সারাজীবন বিনামূল্যে খেলার আসর পড়তে চান ? তাহলে আজই ৪০০.০০ টাকা পাঠিয়ে 'আজীবন গ্রাহক' হোন। 'আজীবন গ্রাহক'রা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পত্রিকা পাবেন। পাবেন প্রতিটি বিশেষ সংখ্যা এবং শারদীয়া সংখ্যাও।



১। আজীবন গ্রাহক চাঁদা তিনভাবে দেওয়া যেতে পারে ঃ—

ক) এককালীন ৪০০ টাকা, অথবা

খ) প্রথমে ১০০ টাকা দিয়ে সদস্যভুক্তির পর পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে বাকি তিনশো টাকা তিন কিস্তিতে জমা দিতে পারেন, অথবা

গ) প্রথমে ৫০ টাকা দিয়ে সদস্যভুক্তির পর পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বাকি চারশো টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে পারেন। কয়টি কিস্তিতে দিতে চান, তা আবেদনপত্রে উল্লেখ করে দেবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে মোট ৪৫০ টাকা দিতে হচ্ছে। একটি কিস্তি থেকে আরেকটির ব্যবধান তিন মাসের বেশী হওয়া চলবে না।

২। এককালীন বা কিস্তি যেমনভাবেই টাকা দিন ; আপনার সদস্যভুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আপনি পত্রিকা পেতে থাকবেন। টাকা জমা দিতে হবে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান—**ইস্টার্ন হরাইজন, ৭, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৩।** কিন্তু চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফট, মনিঅর্ডার পাঠাতে হবে 'ইত্যাদি প্রকাশনী'র নামে।

৩। সদস্যভুক্তির এক বছর বাদে আপনি যে কোন সময় সদস্যপদ প্রত্যাহার করে, দাবি মাত্র টাকা ফেরৎ নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে পুরো গ্রাহক চাঁদা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং আপনার নাম সদস্য তালিকা থেকে বাদ যাবে।

৪। ইত্যাদি প্রকাশনী যদি মনে করে, তবে যে কোন সময়ে গ্রাহক তালিকা থেকে কারুর নাম বাতিল করে দিতে পারবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার পুরো চাঁদা (৪০০ / ৪৫০ টাকা) ফেরৎ পাবেন।

৫। আবেদনপত্রে উল্লিখিত কোন কিস্তির টাকা যদি না দেন, তবে বই পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং আবার কিস্তির টাকা আমাদের কাছে পৌঁছনোর পর থেকে বই পাঠানো শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো পাঠানো সম্ভব নয়। এক বছরের মধ্যে পুরো টাকা না পেলে গ্রাহক তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে এবং প্রদত্ত সংখ্যাগুলির দাম গ্রাহক চাঁদা থেকে বাদ দিয়ে টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

৬। প্রতিটি আজীবন গ্রাহককে সদস্যভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কুপন বই সরবরাহ করা হবে। এই বই থেকে যে কুপন যে সংখ্যার জন্য চিহ্নিত, সেই কুপন প্রতি সপ্তাহে 'খেলার আসর' নেবার সময় এজেণ্টকে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৭। ঠিকানা পাল্টালে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন, অন্যথায় পরে অসুবিধে দেখা দিলে দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে।

৮। কুপন বই হারালে বা আপনার অসাবধানতায় কোন ক্ষতি হলে সে দায়িত্ব আপনার।

৯। আবেদনপত্রের সঙ্গে গ্রাহক চাঁদা এবং সদস্যভুক্তি বাবদ **এককালীন ১০ টাকা** জমা দিতে হবে। এই ১০ টাকা কিন্তু ফেরৎযোগ্য নয়।

বর্ধমানে জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবলের প্রস্তুতি শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ৩০ তম জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বর্ধমানে সর্বত্রই লক্ষ্য করলাম ব্যস্ততার ভাব। আর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে ছেলে ও মেয়ে বিভাগের শীর্ষস্থানের লড়াই। প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ৮ অক্টোবর। আর শেষ হবে ১৪ অক্টোবর। তাই প্রস্তুতির শেষ পর্ব চলেছে বর্ধমানে।.. সংগঠন সমিতির সম্পাদক মানস রায় জানালেন, ছেলেদের ১৫টি এবং মেয়েদের ১২টি রাজ্য দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। আর কয়েকটি রাজ্যের কাছ থেকে দু এক দিনের মধ্যে নাম এসে যাবে বলে তার আশা। যে সমস্ত রাজ্য দল নাম পাঠিয়েছেন তার তালিকাও তিনি জানালেন। ছেলেদের কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মেঘালয়, ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। আর মেয়েদের তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা ও হিমাচল প্রদেশ ছাড়া উপরের সব রাজ্য দলই অংশ নিচ্ছে। তবে ওই তিনটি রাজ্যও অবশ্য নাম পাঠাবে। তাছাড়া দিল্লি, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, চণ্ডিগড় ও গোয়া প্রভৃতি রাজ্যের কাছ থেকে দু' এক দিনের মধ্যেই নাম এসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সব নাম এসে গেলে এইবার রাজ্য দলের অংশগ্রহণে একটা রেকর্ড হবে। কারণ এর আগে এত রাজ্যদল কোন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি।

কে কোন্ গ্রুপে থাকবে এখন থেকেই বলা যাচ্ছে না। বাস্কেটবল ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার টেকনিক্যাল কমিটি খেলার তালিকা তৈরি করেন প্রতিযোগিতার দু'এক দিন আগে। বাঙলার খেলোয়াড় নির্বাচন হয়ে গেছে অনেকদিন আগে এবং অনুশীলনও চলছে পুরোদমে। ছেলেদের কোচ ও সহযোগী কোচ নির্বাচিত হয়েছেন শুভেন্দু ঘোষ ও সুজিত চক্রবর্তী ও মেয়েদের বলাই মল্লিক। বাঙলার ছেলেমেয়েদের রেসিডেন-শিয়াল কোচিং ক্যাম্প শুরু হয়ে গেছে বর্ধমানে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে।

সব খরচ বহন করছে রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল। উদ্যোক্তারা আশা করছেন মোট ছেলেমেয়ে মিলিয়ে বত্রিশটি রাজ্য দলে ৩৮৪ জন খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছে এই প্রতিযোগিতায়। তাছাড়া বি. এফ. আই-এর কর্মকর্তা, রেফারি, সংবাদপত্রের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, রেডিও, টি. ভি. প্রভৃতির ৫০ জনের মতো উপস্থিত থাকবেন। তাহলে



অরবিন্দ স্টেডিয়াম

মোট ৪৩৪ জনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব কম কথা নয়। তাই তারা পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর সংগঠন সমিতির সভায় সভাপতি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে. ভি. আর. প্রসাদরাও জানালেন এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে খরচ পড়বে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার মতো। তিনি সকলের সহযোগিতা পাচ্ছেন। চালকল সমিতি, বাস অ্যাসোসিয়েসন, কোল্ড স্টোরেজ, লায়নস্ ক্লাব, রোটারি ক্লাব, দুর্গাপুর, আসানসোল প্রভৃতি জায়গার সকলের কাছ থেকে সাহায্য আসছে। বর্ধমানে এই প্রথম একটি জাতীয় প্রতিযোগিতার আসর বসছে। তিনি সকলের প্রচেষ্টায় এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের আশা রাখেন। কোষাধ্যক্ষ এস, সি, সামন্ত জানালেন, এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করছে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও আরো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতার উপর। ওই সভায় এস. পি এম. কে. সিং, এ. ডি এম (জেনারেল) এইচ. সেনগুপ্ত, এ. ডি. এম (এল. আর) এ. সি. কল সকলকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে যাতে চলে তার সবরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন।

ছেলে ও মেয়েদের ক্যাম্পে সবসময়ের জন্য পুলিশ পিকেট থাকছে। থাকছে একটি স্পোর্টস ইনজুরি সেন্টার আর রেডক্রশ সংস্থা। লায়নস ক্লাব (বর্ধমান) অরবিন্দ স্টেডিয়ামের চতুর্দিকে কোলাপসিবল গেটগুলো তৈরি করে দিচ্ছে। রোটারি ক্লাব তৈরি করছে সারা স্টেডিয়ামে জলের ব্যবস্থা। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য উদ্যোক্তরা মাত্র ছ'টাকায় সিজন টিকিটের ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্যই স্কুলের প্রধানের কাছ থেকে চিঠি আনলে ওই টিকিট পাওয়া যাবে। তাছাড়া ১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার সিজন টিকিটও পাওয়া যাবে।

খেলা চলবে সকাল ও বিকাল। তবে রাত্রি আটটার মধ্যে খেলাগুলো শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের কোর্টগুলিতে হ্যালোজেন আলো থাকছে। টিকিটের চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। ছ'টাকা ও দশ'টাকার টিকিট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ৫০ টাকার টিকিটেরও চাহিদা বাড়ছে। আটই অক্টোবর এই অরবিন্দ স্টেডিয়ামের আসনগুলো ভরে যাবে দর্শকদের আগমনে। মাঠের বৈদ্যুতিক আলোগুলো জ্বলে উঠবে। শাঁখের আওয়াজে আকাশ বাতাস মুখরিত হবে, ব্যাণ্ডের তালে-তালে রাজ্যদলগুলি মার্চপাস্ট করবে, সেই মুহূর্তে দেখা যাবে এক ঝাঁক সাদা পায়রা। আকাশে অজস্র বেলুন। সমস্ত খেলোয়াড়ের তরফ থেকে বাঙলার অধিনায়ক সংকল্প পাঠ করবেন আর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে ৩০ তম জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা।

বাংলাদেশ দাবাকে জনপ্রিয় করতে বদ্ধপরিকর



টি এন পারমেশ্বরণ খেলছেন ঢাকায় সিলভার কিং দাবায়

ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদ ঃ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে খেলাধূলার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সরকারী অনুদান বেড়েছে প্রতিটি খেলার ব্যাপারে। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ছাড়াও দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। স্বাধীনতার পর পরই অনেক ফেডারেশন গঠিত হলেও—এমন অনেক ফেডারেশন ছিল যার কর্মকর্তাগণ ও ব্যবস্থাপকগণ যেমন কারিৎকর্মা ছিলেন না। যার দরুন অনেক ফেডারেশনের কার্যক্রমকেই উৎসাহী ক্রীড়া— রসিকগণ ভাল চোখে দেখেননি। যার দরুন বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয় এবং তারা বাংলাদেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনেন। বোর্ড প্রথমেই পুরাতন ফেডারেশন-গুলোকে ভেঙে দিয়ে নতুন করে গঠন করেন —কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী ফলে এখন প্রতিটি ফেডারেশন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনই একটা ফেডারেশন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন। গত ফেব্রুয়ারিতে এ ফেডারেশনকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে তাদের সক্রিয়তার দরুণ দেশে একাধিক প্রতিযোগিতাই হয়নি বরং দেশের বাইরেও দাবাড়ুদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা সিলভার কিং রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনা করা। দাবা ফেডারেশনের ছোট্ট অফিস রুমের মধ্যেই তারা ব্যবস্থা করেছেন দাবা অনুশীলনের। প্রতি দিনই দেখা যায় তরুণ-যুব-বৃদ্ধ দাবাড়ুদের একনিষ্ঠ মনে দাবার চাল দিতে।

দাবা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বাংলা-দেশ দাবা দল ইতিমধ্যে পূর্ণ সরকারী মর্যাদায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত অ্যালেখিন স্মৃতি দাবায় অংশগ্রহণ করেছে। সিলভার কিং দাবায় তারা ভারত ও পাকিস্তানের তুখোড় দাবাড়ু-দের ঢাকায় আনতে সক্ষম হয়েছেন। পুরস্কারও তারা পেয়েছেন বৈকি ; ইতমধ্যে ফেডারেশন বিশ্ব দাবা ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডেস সংস্থার সদস্য পদ লাভ করেছে।

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ১৪ অক্টোবর থেকে জাতীয় (অনূর্ধ্ব ১৯ বছরের) জুনিয়র দাবা ও জাতীয় পর্যায়ে মহিলা দাবা প্রতি-যোগিতার দিন ধার্য করেছে। এছাড়া ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফেডারেশন সভাপতি বাংলাদেশের দাবা গুরু ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের নামে একটি আন্তর্জাতিক ইনভি-টেশন দাবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করছেন। এ ব্যাপারে ফেডারেশনের সঙ্গে বাংলাদেশের দাবায় পথিকৃৎ ক্লাব নবদিগন্ত সংসদ যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ফেডা-রেশন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া দাবা ফেডারেশন সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

৮০ সালের শেষাশেষি ফেডারেশন ঢাকাতে আর একটা বড় দাবার আসর বসানোর চিন্তায় আছে। সেটা হল ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মাস্টার সার্কিট প্রতিযোগিতা। এব্যাপারে ফেডারেশন ইতিমধ্যে প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করেছে।

দাবা ফেডারেশন দেশে দাবার প্রচলন বাড়ান, প্রসার বাড়ান, জনপ্রিয় করে তুলুন, এ কামনা করি।

সিলভার কিং আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার ফল

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন বিশ্ব দাবা সংস্থা-ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনালে ডেস এসেজ (FIDE)-এর সদস্যপদ লাভের পূর্বেই ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন, ঢাকা মোহা-মেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ঢাকা দাবা ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ২০ জুলাই থেকে সিলভার কিং



ভারতের জীলা বিশ্বাস ঢাকায় ষষ্ঠ মহসীন দাবায় চাল দিচ্ছেন



বাংলাদেশের নিয়াজ

আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের ৫ জন আন্তর্জাতিক রেটেড খেলো-য়াড় টি এন পরমেশ্বরণ, ম্যানুয়েল এ্যারন, রফিক খান, মোহাম্মদ হাসান ও সৈয়দ নাসির আলী, পাকিস্তানের আব্দুর রশিদ ও শাহজাদ মির্জা এবং স্বাভাবিক দেশ বাংলাদেশের নিয়াজ মোরশেদ, রেজাউল হক ও ইউনুস হাসান এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। এক হাজার মার্কিন ডলারের সম-পরিমাণ নগদ অর্থ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার হিসাবে বিতরণ করা হয়।

গত ২০ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্যাফেটেরিয়ায় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী।

ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন টি এন পরমেশ্বরণ প্রথম থেকেই আস্থার সঙ্গে খেলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করতে থাকেন। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন নিয়াজ মোরশেদ সব সময় পরমেশ্বরণের থেকে আধ পয়েন্ট পিছনে থেকে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকেন। শেষ রাউণ্ডে নিয়াজ মোরশেদ ভারতের আন্তর্জাতিক মাস্টার ম্যানুয়েল অ্যারনের কাছে পরাজয় বরণ করেন। নিয়াজের এটাই ছিল প্রথম পরাজয়। এই জয় ম্যানুয়েল অ্যারনকে দ্বিতীয় স্থানে এনে দেয় ; নিয়াজ ও অ্যারন দুজনেই ৬ পয়েন্ট অর্জন করেন। টাইব্রেকিং এস/বি গণনাতেও দুজনের সমান ২২'২৫ পয়েন্ট হয়।

পরমেশ্বরণ ৮ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন। তার দুটি খেলা নিয়াজ মোরশেদ ও মোহাম্মদ হাসানের সঙ্গে অমীমাং-সিতভাবে শেষ হয়।

প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী।

প্রতিযোগিতার রাউণ্ড রবীন লিগ পদ্ধতি-তে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার পূর্ণ স্কোর কার্ড নীচে দেওয়া হলো ঃ—

		১	২-৩	২-৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	পয়েন্ট
১	পি এন পরমেশ্বরণ	—	১/২	১	১/২	১	১	১	১	১	১	৮
২—৩	নিয়াজ মোরশেদ	১/২	—	০	১/২	১/২	১	১/২	১	১	১	৬
২—৩	[illegible]	০	১	—	১/২	১	০	১/২	১	১	১	৬
৪	[illegible] হাসান	১/২	১/২	১/২	—	০	১/২	১	১/২	১	১/২	৫
৫	সৈয়দ নাসির আলী	০	১/২	০	১	—	১	১/২	১	০	১	৫
৬	রফিক খান	০	০	১	১/২	০	—	১	০	১	১	৪-১/২
৭	[illegible] রশিদ	০	১/২	১/২	০	১/২	০	—	১/২	১	১/২	৩-১/২
৮	শাহজাদ মির্জা	০	০	০	১/২	০	১	১/২	—	১	০	৩
৯	রেজাউল হক	০	০	০	০	১	০	০	১	—	১	৩
১০	ইউনুস হাসান	০	০	০	১২	০	০	১/২	০	০	—	১

শব্দ জব্দ

দেবাশিস সরকার
একাদশ শ্রেণী,
ডায়মণ্ডহারবার হাই স্কুল,
পোঃ-ডায়মণ্ডহারবার, জেলা-২৪ পরগণা।

পাশাপাশি

১। অতীতের এই ডাকসাইটে পাকিস্তানী ক্রিকেটারের ছেলে এবছরের গোড়ার দিকে পাকিস্তান যুব ক্রিকেট দলের সদস্য হিসেবে ভারত সফর করে গেছে।

৩। গত মিউনিখ ও মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে ৫,০০০ হাজার ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ের নায়ক।

৫। এবছর সাদা-কালো জার্সি গায়ে মাঠে নামা দুই ইরানীর অন্যতম।

৭। এই ভারতীয় খেলোয়াড় এবছর পর পর দুটি আন্তর্জাতিক টেনিসের জুনিয়র বিভাগ জয় করেছেন।

৯। ১৯৭৪-এ ব্যাংককে এশীয় যুব ফুটবলে ভারতীয় দলের কর্ণধার।

উপরনীচ

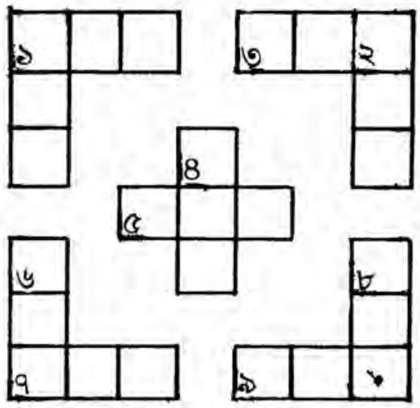
১। ১৯৭৮ ইংল্যাণ্ড সফরে এই পাকিস্তানী ব্যাটসম্যান ভাল খেলা দেখিয়েও পরবর্তীতে দেশের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টের একটিতেও জাতীয় দলে প্রথম এগারো জনে ঠাঁই পাননি

২। ১৯৭১ সালে পোর্ট অফ স্পেনে ভারতীয় ব্যাটিং শক্তিকে ভোঁতা করে দিয়েছিলেন এই ক্যারিবিয়ান বোলার ১৫ রানে ৯ জন ভারতীয়কে ঘায়েল করে।

৪। বিশ্ব ক্রিকেটে স্মরণীয় নাম।

৬। ১৯০২ সালে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের প্রথম আবির্ভাবে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে দলের পক্ষে প্রথম উইকেট পেয়েছিলেন এই বোলার

৮। এবছর ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট লিগে সর্বোচ্চ উইকেট কব্জা করেছেন এই দ্রুতগতিসম্পন্ন বোলার।



সমাধান (২১.৯.৭৯)

পাশাপাশি	উপর-নীচ
২। অ প সাঁ	১। হেনরী কুপার;
৩। ডি ডি;	৩। ডিকো;
৪। কাট;	৫। টস;
৮। পাতাম;	৬। বোথাম;
৯। নায়ার;	৭। পাটনা;
১০। সন্মথ;	৮। পায়াস;
১২। স্কোয়াশ;	১১। রমেশ,

এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ জব্দের সঙ্গে পাঠান।
নাম ————
অভিভাবকের নাম ————
ঠিকানা ————
বিদ্যালয় ————
বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ————
বিদ্যালয়ের সীলমোহর ————

শিল্ড ফাইনাল/১৯৭৯

নিতাই ঘোষ

কে জিতবে? কে জিতবে?
বাজাও কোষে ঢোলটি-কে
টাকায় মাপা যায়না যাহা
করবে এমন গোলটি-কে?
শিল্ড কে পাবে শুধাই ডেকে
সবুজ মেরুণ দলটি-কে
গৌতম ভাই খেলল খাসা
গোলে পাঠায় বলটি-কে।
ইস্ট-মোহন লড়ল আবার
আই এফ এ'র শিল্ড-টিতে
দুই বড় দল খেলল জবর
সবার সেরা, ফিল্ড-টিতে,
একখানি গোল করল মোহন
ফেলল ওদের প্যাঁচটিতে
ভাল খেলেই মোহনবাগান
জিতে গেল ম্যাচ-টিতে।



দিলীপ পালিত প্রসঙ্গে

৩১ আগস্ট 'খেলার আসরে' প্রকাশিত 'মোহনবাগান—অধিনায়ক দিলীপ পালিত কি অসুস্থ ছিল না অসুস্থ বানানো হয়েছিল' লেখাটি পড়ে চমকে উঠলাম, বুঝতে পারলাম লেখাটির জন্মদাতা কোন দলের অন্ধ সমর্থক। লেখাটি পড়ে সেই স্টাফ রিপোর্টারের অবগতির জন্যে কিছু জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

১) পি কে ব্যানার্জি মোহনবাগানে কোচ হয়ে আসার সময়ে ক্লাব কর্মকর্তাদের কাছে কয়েকটি শর্ত রেখেছিল। তার একটি, চূড়ান্ত দল গঠন নিয়ে কারো কোনরকম হস্তক্ষেপ করা যেন না হয়। মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ তা মেনে নিয়েছিলেন। আর দল গঠন নিয়ে টিম সিলেকশন কমিটির সঙ্গে পি কে-র কোনরকম অপ্রিয় ঘটনা আজ অবধি ঘটেনি। তবে কেন স্টাফ রিপোর্টারের খুঁটিয়ে গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা? ওর অত মাথা ব্যথার কারণ কি?

২) দিলীপ পালিত প্রথম এগারোজনের মধ্যে আসে কিনা সবচেয়ে ভালভাবে জানবে একমাত্র কোচ। কোচ যা মনে করেছেন, তাই করেছেন। কোচ প্রয়োজনে কলম ধরতে পারবেন কিন্তু কলমচি প্রয়োজনে কোচ হতে পারবেন না কোনদিন, এটা স্টাফ রিপোর্টারের বোঝা উচিত ছিল।

৩) পি কে কম্পটনকে দিয়ে ফ্ল্যাগ তোলাতে বাধ্য হয়েছেন। সেই সময়ে আমি পাশে ছিলাম। দিলীপ পালিতকে অসংখ্য বার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে, একরকম অপমানিত হয়েই কম্পটনকে দিয়ে ফ্ল্যাগ তোলান হয়। পরে সুব্রতর অনুরোধে দিলীপ পালিত আসে। পি কে-র অনুরোধ রক্ষা না করে সেই পরিস্থিতিতে সুব্রতর অনুরোধ রক্ষা করাটাও পি কে-কে অপমানিত করার একটা পন্থা। দোষটা কার? পি কে-র না দিলীপ পালিতের?

৪) —'কি করে তুমি চান্স পাও দেখে নেব' এই কথাটা শুনে বা পড়ে দিলীপ পালিতও নিশ্চয়ই হাসবেন। জানতে ইচ্ছা করে স্টাফ রিপোর্টারের কাছে কি পি কে-র ওই মন্তব্যটি টেপ করা আছে?

৫) পেলে ম্যাচে পি কে অনেককেই মাঠে নামিয়েছিলেন। একটা খেলায় বাইশ তেইশজন খেলোয়াড় কোন না কোন সময় মাঠে নামলে পৃথিবী-শুদ্ধ লোক, যে খেলা বোঝে না, সেও যে হাসবে, পি কে যা করেছেন আমার মনে হয় ভালই করেছেন।

৬) দিলীপের বদলে কম্পটন প্রায় ম্যাচেই খেলেছে, আমার প্রশ্ন কম্পটন দিলীপের চেয়ে কি কিছু খারাপ খেলেছে?

৭) অধিনায়কের অবাধ্যতা প্রসঙ্গ তুলে ক্লাবের সুদিনে অশান্তির কালো মেঘ ওড়াতে চায়নি পি কে। তিনি শান্তি ভালবাসেন, অশান্তি নয়।

একজন মানুষের ক্রমাগত সাফল্য কেউ সহ্য করতে পারে না, ভারতীয় ফুটবলের মহম্মদ আলী পি কে-কে আজ তার ক্রমাগত সাফল্যের জন্য অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। পি কে মানুষটাই প্রতিটি মানুষকে, যারা খেলার খবর রাখেন, চুম্বকের মত কাছে টানে। তখন পি কে ইস্টবেঙ্গলে। মোহনবাগানের সমর্থক হয়ে অসংখ্য সমর্থক নিয়ে পি কে-র কোচিং দেখতে যেতাম। প্রিয় দলের কোচিং না দেখে, যেমন আজ অনেক ইস্টবেঙ্গল সমর্থক প্রিয় দলের কোচিং না দেখে পি কে-র কোচিং দেখতে আসে, যারা রোজ সকালে পি কে-র কোচিং দেখেছেন, তারা জানেন আর যারা তার সঙ্গে মিশেছেন, —পি কে মানুষটা কত বড়, তার ভালবাসা কত অকৃত্রিম। এই জন্যেই ক্লাব হারলে বা জিতলে তার চোখ দিয়ে জল নির্গত হয়। চোখের জল অত সস্তা নয়।

অমরেন্দ্র নাথ ধর, ২৩৪ জামাল রোড, পাটনা—৪০০০০১

পাঠকের কলমে

স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়ুন

এবার ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়পুষ্ট আমাদের প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা দেখে ও শুনে আমরা হতাশ। টিম কম্বিনেশন নেই, খেলোয়াড়দের আন্তরিকতা নেই,—শুধুমাত্র টাকা রোজগারের জন্যই যেন ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মোহনবাগানে খেলোয়াড়রা ঠাঁই খোঁজেন। কোথায় সেই আন্তরিকতা, কোথায় সেই একাগ্রতা—যা যে কোন খেলোয়াড়ের কাছে ক্রীড়াপ্রেমীর কাম্য। ইস্টবেঙ্গল সারা বাংলায় খেলোয়াড় খুঁজে পেল না, সত্যি করে বলতে গেলে তেমন করে খোঁজই করেনি—ধরে আনল পাঞ্জাব থেকে হরজিন্দর, মনজিৎদের যারা নিজেদের অর্থ-স্বার্থ ছাড়া ক্লাবের স্বার্থ দেখল না, ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষা করল না। আগামীতে এদের বাদ দেওয়া হোক। ক'বছর ধরে ক্লাব তো লিগ, শিল্ড কিছুই পাচ্ছে না, না হয় আরও ক'বছর পাবে না। কিন্তু নতুন খেলোয়াড় এর মধ্যে গড়ে তোলা হোক, যারা জান-প্রাণ দিয়ে লড়বে। হারুক আপত্তি নেই, কিন্তু ফুটবলকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে, ক্লাবকে আবার শৌর্যময় প্রতিদ্বন্দ্বিতার গৌরবে উজ্জ্বল করে তুলবে। বাংলা ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান। সেখানে ভিন রাজ্য থেকে খেলোয়াড় আমদানি করতে হবে কেন? ক্লাবগুলির কি দায়িত্ব নেই স্থানীয় ছেলেদের মধ্য থেকে খেলোয়াড় গড়ে তোলা? পেশাদারী ফুটবল যখন অপেশাদারীর খোল-নলচের আড়ালে চলছে তখন এত অর্থ অপব্যয় করে তথাকথিত নামী- দামীদের আমদানী না করে, শীর্ণ-জীর্ণ-দীর্ণ ক্ষুধাক্রিষ্ট বাংলার খেলোয়াড়দের উন্নতির পিছনে ব্যয়িত হোক। বলছি না বাইরের খেলোয়াড় আসবে না—আসবে, কিন্তু তার আগে ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে ঘরের সন্তানদের সঠিক এবং আধুনিক ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করা হোক, কিছু গঠনমূলক প্রচেষ্টার জন্য অর্থ খরচ করা হোক।

নন্তু মুন্না, বুবুল দাশগুপ্ত।
কলেজ রোড, শিলচর।

সম্বল রেডিও ও খেলার আসর

আমি একজন পল্লীগ্রামের মেয়ে। গ্রাজুয়েট। ফুটবল খেলা ভীষণ ভালবাসি। 'মোহনবাগানের' অন্ধ সাপোর্টার। কিন্তু যেহেতু আমি পল্লীগ্রামের মেয়ে, সেইজন্য ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া (গ্রামের মধ্যে যা হয়) কেউই পছন্দ করে না। নানা ধরনের কটু মন্তব্য করে। মেয়েদের কাজ, সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেন। আমি রেডিওর ধারাবিবরণী শুনে ও 'খেলার আসর' দেখে আশা মেটাচ্ছি।

মীরা মণ্ডল, বর্ধমান।

লিগে সেরা পাঁচটি ম্যাচ

৩১ আগস্ট খেলার আসরে প্রবীরবাবু, সুবীরবাবু উৎপলবাবুর চিঠিতে দেখলাম তারা দর্শকদের অনুরোধ করেছেন এবছরের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি লিগ ম্যাচগুলির নাম লিখতে। আমার মতে,

১। ইস্টবেঙ্গল—জর্জটেলিগ্রাফ।
২। মহমেডান—এরিয়ান্স।
৩। মহমেডান—জর্জটেলিগ্রাফ।
৪। ইস্টবেঙ্গল—মহমেডান।
৫। মোহনবাগান—স্পোর্টিং ইউনিয়ন (দ্বিতীয়ার্ধে)

সরিৎ মজুমদার, বেলেঘাটা, কলিকাতা-১০



ওরাও মানেন

'ওরাও মানেন' শীর্ষক লেখাটিতে কিছু তথ্য হয়তো নিজের ভুলেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। আমি কিন্তু খুব ভালভাবেই জানি প্রসূন ব্যানার্জির খেলার দিন পকেটে একটা সবুজ রুমাল থাকবেই থাকবে। এবং বড় খেলার দিন তিনি একটি মুরগী খাবেন এবং একটি পুরনো পাঞ্জাবী পরে মাঠে আসবেন। পি কে ব্যানার্জি কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে থাকাকালীন এবং মোহনবাগানের একবছর, ছাই রংয়ের হাওয়াই শার্ট পরতেন, তারপর তার জামার রং বদল হয়েছে। বয়স্ক কলাপাতার রং এখন তিনি পরেন। শ্যামের কিন্তু খেলার দিন, বিশেষ করে বড় খেলার দিন ছবি তুললে রেগে যান, এটাই তার সুপারস্টিশন।

বাবু ধর, পাটনা-১, জামাল রোড।

একটি প্রস্তাব —আই এফ এ-কে

লিগ, শিল্ড দেখতে দেখতে চলে গেল। একাধিক নামী স্টারের মেলা এবার বাংলার ফুটবলে। সুতরাং কে বা কারা এবার সন্তোষ ট্রফিতে মনোনয়ন পাবে তার ঠিক নেই। যারাই মনোনীত হোক তাতে আগে থাকতেই আমরা যেন আত্মতুষ্টিতে না ভুগি।

এ বিষয়ে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটি হলো—সন্তোষ ট্রফির জন্য মনোনীত খেলোয়াড় ছাড়াও অন্য খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি টিম গঠিত হোক। এবং বাংলা একাদশ ও অবশিষ্ট বাংলা একাদশের মধ্যে এক বা একাধিক প্রদর্শনী ম্যাচ সম্ভব হলে জেলাগুলিতে বা কলকাতায় দেখানো হোক।

আমাদের মনে হয় এতে বাংলা টিম সুসংগঠিত হবে এবং প্রদর্শনী ম্যাচে সংগৃহীত অর্থও বাংলার ফুটবলের স্বার্থের সহায়ক হবে।

অমল তালুকদার, শ্রীবাস দাস ও
দিলীপ শীল, অশোক নগর,
২৪ পরগণা।

এবারের লিগ ও চুনী গোস্বামীর ভবিষ্যদ্বাণী

ভাল দল থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গল রানার্স হয়েছে, আর মহমেডান স্পোর্টিংই তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মোহনবাগানকে তুলে দিয়েছে, এ কথা আজ আর নতুন করে বলতে হবে না, কিন্তু আশ্চর্য ভবিষ্যৎদ্রষ্টা চুনী গোস্বামীর বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হয় বৈ কি!

এবারের ফুটবল লিগের দল গঠনের পর প্রথম দিকেই, ১৩ এপ্রিলের 'খেলার আসরে' চুনী গোস্বামীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে—লিগে খেলা একটাই, সেই মোহনবাগান— ইস্টবেঙ্গল। মহমেডান স্পোর্টিং সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল— 'তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ মহমেডানের পক্ষে এবার কোনো ওলট-পালট করা সম্ভব হবে না।' আর 'তাদের কাছে বিরাটতম প্রত্যাশা বলতে কিছুই নেই।' তার এই লেখাও যুক্তিহীন কয়েকটি যুক্তি নিয়ে 'পাঠকের কলমে'তে আগেই সমালোচনা হয়ে গেছে। সে প্রসঙ্গে আমি আর নাই বা গেলাম! এবার লিগের চরমতম চাবিকাঠিটি যে মহমেডানের হাতেই লুকানো থাকতে পারে, এ তো চুনীর ভাবনার বাইরে ছিল। আমরা সাধারণ ফুটবলপ্রেমীরাও অবশ্য তা ভাবিনি, তবে চুনী গোস্বামী বড় ফুটবল -বোদ্ধা। তার চুলচেরা বিশ্লেষণ, মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা' থেকে পিণ্টু চৌধুরীর নামটাই বাদ গেল কেন, তা জানা যায় কি? হাবিব তো বুড়ো, তার কাছে স্ট্রাইকার হিসাবে অন্তত চুনীর কোনো প্রত্যাশাও ছিল না। তবু সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। সেই পিণ্টু, সেই হাবিব,—'তারাই দিলে আমার মুখ (কলম) খুলে।' বড় ফুটবলার খ্যাতনামা সাংবাদিক চুনী গোস্বামীর এই ঐতিহ্যবাহী মহমেডান স্পোর্টিং দলটিকে এত হেয় চোখে দেখার কারণটি ঠিক বোধগম্য হল না। অবশ্য লিগের প্রথমদিকে মহমেডান সত্যিই ভালো খেলেনি, তবুও ওস্তাদের মার তো শেষ রাত্রেই। তাই, 'ভবিষ্যতে চুনীর কাছ থেকে কোনো ব্যাপারে 'চুলচেরা মনস্তাত্ত্বিক' সমালোচনা পেলেও কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী পাব না, এটা আশা করা কি খুব অনুচিত হবে? খেলার ফল খেলার হাতেই থাক না, আগে থেকেই তাকে কাগজে কলমে বেঁধে রাখার দরকার কি? আর হ্যাঁ, একটা কথা, খেলোয়াড় চুনী গোস্বামীকে দুর্দান্ত মোহনবাগানপ্রেমী হিসাবে চাইলেও সাংবাদিক চুনীকে কিন্তু আমরাই নিরপেক্ষ চাই।

সুদক্ষিণা গুপ্ত, টিটাগড়।

আসলে কোনটি ঠিক?

৩১ আগস্ট 'মানস ভট্টাচার্য কিভাবে এগিয়ে চলেছে'—শীর্ষক লেখাটিতে লেখক

ম [illegible] চট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন [illegible] ভৌমিকও আউটের প্লেয়ার হিসেবে [illegible] গোলদাতার শিরোপা পেয়েছিল ৭৩ [illegible] ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ২৪টি গোল দিয়ে। [illegible] গোল সংখ্যা তার চেয়ে আর একটি [illegible] কিন্তু যতদূর জানি সুভাষ সে বছর [illegible] লিগে ১১টি খেলায় ২১টি ও [illegible] লিগের তিনটি খেলায় ২টি মোট ২৩টি [illegible] করে। যেমন:—হাওড়ার বিপক্ষে (১ [illegible] (২) বাটা (১) জিমখানা (৩ [illegible] পুলিশ (১) মহঃ স্পোর্টিং (২) [illegible] (২) এরিয়ান (২) জর্জ টেলিগ্রাফ (১) মোহনবাগান (১) বি এন আর (২) [illegible] (৩) সুপার লিগ:—টালিগঞ্জ (১) মোহনবাগান (১) অর্থাৎ সুভাষ সিঙ্গললিগ ও সুপার লিগ মিলিয়ে মোট ২৩টি গোল করে। ২৪টি নয়। যদি এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানান খুব ভালো হয়।

মানস কুমার রায়, রিষড়া, হুগলী।

উত্তর কলকাতার ফুটবল মাঠ

ভারতীয় ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য আজ সমস্ত ভারতীয় ফুটবলপ্রেমী উদ্গ্রীব। কিন্তু আজ ১৯৭৯-এর শেষভাগে ফুটবলের মক্কা কলকাতার উত্তরাংশের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় (বিডন স্ট্রিট এলাকা) মাত্র তিনটি ফুটবল মাঠ তাও সবসময় পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানকার বাচ্চারাও খেলতে চায়, তারাও ভবিষ্যতে স্টার হবার স্বপ্ন দেখে। অথচ প্রতিভাও প্রচেষ্টা দুই থাকা সত্ত্বেও বড় হতে পারে না। প্রশিক্ষকের অভাব নেই, প্রশিক্ষণের জায়গার অভাব। সুতরাং গলিতে রবার বল খেলে প্রতিভার অপব্যবহার করে। অনেক সময় গলিতে খেলার ফলে পল্লীবাসীও অসন্তুষ্ট হয়। একারণেই আপনাদের এই বহুল প্রচারিত পত্রিকাকে এবং আপনাদের মাধ্যমে কিছু উৎসাহী ফুটবল প্রেমীকে অনুরোধ করছি যে দয়া করে এই এলাকার কিছু অপ্রয়োজনীয় পার্ককে ফুটবল মাঠের আকার দিতে। তাতে এই এলাকার বাচ্চারা উন্নতি করতে পারে। কে বলতে পারে যে এই এলাকা থেকেই একজন ভবিষ্যত ওলিম্পিক ফুটবলার আসবে না।

প্রদীপ বসু
ঈশ্বরঠাকুর লেন, কলকাতা-৬

মেয়েরা মাঠে কেন ঃ প্রতিবাদ

৩১ আগস্ট দেখলাম 'মেয়েরা মাঠে কেন ?' পড়ে খুব অবাক লাগল। সঞ্জয়বাবু, আপনি তো একজন আধুনিক যুগের মানুষ। এই যুগের মানুষ হয়েও মেয়েদের মাঠে যাওয়া নিয়ে সমালোচনা করছেন। আপনার এই মধ্যযুগীয় মনোভাবকে স্বাগত না জানিয়ে পারছি না। আপনি একথা কি করে বললেন ক্রিকেটারদের প্রতি মেয়েদের দুর্বলতা [illegible] এখন ফুটবলাররাও ভাগ্যবান। অর্থাৎ মেয়েরা ফুটবলারদের প্রতি দুর্বলতাবশত মাঠে যায় [illegible] অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার ধারণা দেখে [illegible] আপনার এই ধারণাকে স্বাগত জানাই, [illegible] যদি কোনদিন মাঠে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনার মনে হয় প্র্যাকটিসের সময় আপনার নজর ফুটবলারদের উপর না থেকে সেই সময় [illegible] উপরই ছিল। তা না হলে আপনি এরকম একটা ধারণা করেন কি করে ? এই [illegible] দ্বারা সমস্ত মেয়েকে আপনি [illegible] করেছেন [illegible] ভালোবাসা বলতে আপনি কি [illegible] চেয়েছেন ? আর কোচ প্রদীপবাবু এতবড় একজন আন্তর্জাতিকমানের খেলোয়াড় হয়ে কি করে এই ধারণা মনে পোষণ করলেন মেয়েরা মাঠে যায় খেলা দেখতে নয়, খেলোয়াড়দের দেখতে। আর সঞ্জয়বাবু 'খেলার আসর' এখন সেরা পত্রিকার মধ্যে অন্যতম, এইরকম একটা সর্বজন-বহুল পত্রিকায় এইভাবে লিখে আপনি খুব একটা উচ্চমানের পরিচয় দেননি। এই লেখা দেখে কোন মেয়েরই চুপ করে থাকা সম্ভব নয়।

স্নিগ্ধা ভাদুড়ী, পাইকপাড়া।

সব দোষ কি মেয়েদেরই ?

সঞ্জয় দে মহাশয়ের 'মেয়েরা মাঠে কেন ? মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতায় যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম।

তার প্রথমেই জেনে রাখা প্রয়োজন, মেয়েদের পক্ষে খেলার মাঠের অস্বস্তিকর ও নিরাপত্তাবিহীন পরিবেশে গিয়ে খেলা দেখা সম্ভব হয় না। সেইজন্যই প্র্যাকটিস দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়।

'মেয়েরা খেলার কিছু বোঝে না'—বর্তমান পরিস্থিতিতে লেখকের এইরূপ মন্তব্য কি যুক্তিগ্রাহ্য ? যখন ফুটবলে বাংলার মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত প্রসার ঘটছে তখন তার এই মন্তব্য কি মেয়েদের প্রতি তার বিরূপ মানসিকতাই প্রকাশ করে না ?

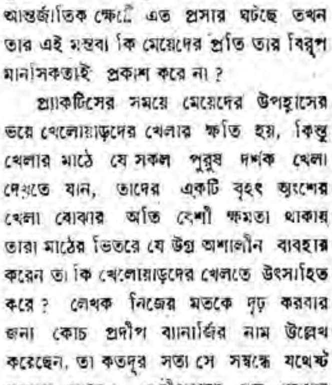
প্র্যাকটিসের সময়ে মেয়েদের উপহাসের ভয়ে খেলোয়াড়দের খেলার ক্ষতি হয়, কিন্তু খেলার মাঠে যে সকল পুরুষ দর্শক খেলা দেখতে যান, তাদের একটি বৃহৎ অংশের খেলা বোঝার অতি বেশী ক্ষমতা থাকায় তারা মাঠের ভিতরে যে উগ্র অশালীন ব্যবহার করেন তা কি খেলোয়াড়দের খেলতে উৎসাহিত করে ? লেখক নিজের মতকে দৃঢ় করবার জন্য কোচ প্রদীপ ব্যানার্জির নাম উল্লেখ করেছেন, তা কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রদীপবাবুর মত কোচের পক্ষে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়ের এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয় এবং এই দুর্বলতা খেলোয়াড়োচিত মনভাবের অভাবই প্রকাশ করে। এর প্রতিকার-স্বরূপ লেখক যে কি করে মেয়েদের খেলার মাঠে যাওয়াটাই দোষের ভাবলেন তা সত্যিই হাস্যকর। ভয় হয় অদূর ভবিষ্যতে হয়ত কোনদিন শুনতে হবে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাড়ি-চাপা রূপ বিপদ সৃষ্টির জন্য মেয়েদের পথে বের হওয়াই বন্ধ।

আধুনিক যুগের মেয়েদের সর্বক্ষেত্রের এই অগ্রগতিকে ফ্যাশন রূপে দেখার এই মধ্যযুগীয় মনোভাব কেন ?

বুলা, শ্বেতা, টিক্কু, কলকাতা-৬।

সাবাস গাভাসকর

ভারত-ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ ও সর্বশেষ টেস্ট



ম্যাচ খেলায় ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক গাভাসকরকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সেদিনের খেলার ধারাবিবরণী শুনে মনে হচ্ছিল যে এক্ষুণি গিয়ে গাভাসকরকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে আসি এবং দু'হাত ধরে তাকে জড়িয়ে ধরে বলি যে ভাই তুমিই একমাত্র এই বিপদের দিনে আমাদের দেশের উদ্ধার কর্তা। সেদিন তুমি না থাকলে আমাদের মান-সম্মান সব রসাতলে তলিয়ে যেত। সাবাস ভাই গাভাসকর! সাবাস! তুমি আমাদের মুখ রেখেছ। কিন্তু তবুও কি ভারতীয় কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মহাশয়ের চোখ খুলবে না ? গাভাসকরের মত এক বিচক্ষণ খেলোয়াড়কে অধিনায়কের পদ হতে সরিয়ে দিয়ে কি ভুল করেছেন তা হয়ত তিনি আজ বুঝেছেন এবং সেই ব্যথা মর্মে মর্মে অনুভব করছেন।

ঝুলন ঘোষ ও দোলন ঘোষ (পালাজুড়ি)
সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

বারংবার অধিনায়ক বদল কেন ?

আবার তারিফ করতে হয় ভারতীয় ক্রিকেট নির্বাচক মণ্ডলীকে—এমন উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া এরকম সুষ্ঠু সমাধান অন্য কারো দ্বারা আবিষ্কার সম্ভব হত কি ? যে খেলোয়াড়টিকে গত মরশুমে অধিনায়কত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তা যে কারণেই হোক, আবার তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম দুটি টেস্ট ম্যাচের অধিনায়কত্বের। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, যে কারণের জন্য তার কাছ থেকে অধিনায়কত্বের পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই আর এখন নেই। এটা অধিনায়কত্ব দেওয়ার ব্যাপারে অজুহাত হিসাবে থাড়া করা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না অধিনায়কত্ব অন্য জনের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার কারণটা কি ? শুধুমাত্র আশানুরূপ ফলের পরিপ্রেক্ষিতে তো আর এই দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া যায় না, কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, তার ইংল্যাণ্ড সফর ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী, যেকোন জ্ঞানীজনের কাছ থেকে জানা যাবে, যে ঐটুকু সময় কোনরূপ অসমান্য সাফল্য অর্জনের পক্ষে প্রশস্ত নয়।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে কি আমাদের হকি, ফুটবল বা ক্রিকেট ইতিহাসে। এর ফল কিন্তু আমরা বারবার দেখেছি, হকির মর্যাদা ধূলায় মিশিয়ে যেতে দেখেছি, ফুটবলের মান ক্রমশঃ শূন্যে পৌঁছতে দেখেছি—এখন দেখছি ক্রিকেটের পালা। আমি বুঝি না বারবার অধিনায়ক বদল করার যৌক্তিকতা কোথায়। এসব দেখে মনে হওয়া কি অস্বাভাবিক যে ওই সব খেলোয়াড়রাও ক্ষমতার জন্য লালায়িত—দেশের মান, মর্যাদা যাদের হাতে, তাকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব যাদের কাঁধে তাদের কাছে কিন্তু ওইরকম আচরণ আশা করা যায় না। সাধারণের চেয়ে কিছুটা অসাধারণ না হলে আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পাঠানোর সার্থকতা কোথায় ? এটুকু মনে রেখে খেলোয়াড় নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষতার অর্থটাকে পরিস্ফুট করে যদি আমরা দল গড়ি, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোন বিরূপ মন্তব্য উঠত না। হকি, ফুটবল নিয়ে ভাববার দিন চলে গেছে, যা নিয়ে তবু চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে, তার লোপ পাওয়া কিন্তু কারও অভিপ্রেত নয়—এরকম মনোভাব মনে হয় কোন বিপক্ষ দলেরও নেই। আমরা আন্তরিকতা ছাড়াই বাহবা পাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাতো হবার নয়—কোনও দেশের স্থায়ী উন্নতির পিছনে কি পরিমাণ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ছিল তার মূল্যায়ন কিন্তু আমাদের লজ্জা দেবে।

শঙ্কর ভট্টাচার্য, কলকাতা-৮।

গঠনমূলক সমালোচনা কাম্য কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কোন বিষয় আলোচনায় স্থান পায় না। চিঠির উপরে অবশ্যই 'পাঠকের কলমে' উল্লেখ করবেন। তা না হলে ওই চিঠি সময়মত পাওয়া যায় না।

ওভাল টেস্টে বেঙ্কটরাঘবনের নেতৃত্ব কি সঠিক ছিল ?

ওভালে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের শেষ টেস্ট ম্যাচটি অবশেষে ভারত 'ড্র' করতে বাধ্য হল। টেস্ট শুরু হওয়ার আগে ক্রিকেটের চিন্তাবিদরা গাভাসকরের খামখেয়ালি মেজাজ নিয়ে 'খেলার আসরে' অনেক আলোচনা করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে তিনটি টেস্ট ম্যাচ গাভাসকরের খামখেয়ালি মেজাজের নজির না পেয়ে হয়তো বা তারা কিছুটা হতাশ হয়েছেন এবং তার ব্যাটিং নৈপুণ্যে আনন্দলাভ করেছেন। প্রথম টেস্টে নিঃসন্দেহে ভারতের খেলোয়াড়রা ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীদের হতাশ করলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে ক্রীড়ামোদীদের আনন্দ দিতে পেরেছেন বলেই আমাদের ধারণা। যাই হোক, শেষ টেস্ট ম্যাচকে গাভাসকর যখন জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিলেন এবং যখন আর মাত্র ৭৩ রান বাকী তখন বেঙ্গসরকর আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন, সেই সময়ে চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবন বিশ্বনাথের পরিবর্তে কপিলদেবকে নামিয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি শেষ টেস্ট ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ার মূল কারণ ওইখানেই নিহিত রয়ে গেল। কারণ, ইংল্যাণ্ডের ফিল্ডাররা তখন বদ্ধপরিকর যে তারা চার রান নিতে দেবেন না। তাই চারজন ফিল্ডারকে বাউণ্ডারি লাইনের ধারে নামিয়ে দিলেন। প্রচুর পরিমাণে রান করে গাভাসকর তখন বুঝিবা কিছুটা ক্লান্ত। এই অবস্থায় চার রান করতে ওস্তাদ অথবা পিটিয়ে খেলতে পারেন এমন ধরণের অপ্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান কপিলদেবকে না নামিয়ে প্রতি বলে একটি অথবা দু'টি রান নিতে পারেন এমন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান হিসাবে গাভাসকরের সঙ্গে বিশ্বনাথকে নামানো অনেক যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং তাই করলে শেষ টেস্ট ম্যাচ হয়তো ভারতের হাতছাড়া হতো না।

অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবনের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রান আউট হওয়া ম্যাচটিকে আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের আসন্ন টেস্ট ক্রিকেটে বেঙ্কটরাঘবনের দূরদর্শিতার পরিচয় মিলবে—এই আশা করেই আমাদের বক্তব্য শেষ করছি।

ননীগোপাল লায়েক, তপন ব্যানার্জি,
বিশ্বজিৎ ঘোষ।
পোঃ বামুনতোড়, (বাঁকুড়া)।

ময়দানের কড়চা

আই এফ এ শিল্ড এবারও জমল না। চারটি খেলার ভাল-মন্দ নিয়ে দর্শক, সমর্থকদের চিন্তা-ভাবনা ছিল। অন্য খেলা যেন নিয়ম রক্ষা। একটু আলোড়ন এনেছিল দক্ষিণ কোরিয়া দল ও কুয়েতের কাজমা দল। অর্থ-ব্যয় মন্দ হয়নি। আই এফ এ-র সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল 'বোরোলীন' নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কলকাতার দর্শক তেমন কিছু পেল না। ওরই মধ্যে মনে থাকবে দক্ষিণ কোরিয়ার নৈপুণ্য, ওরা সত্যি ভাল খেলেছে। কাজমা দলের একমাত্র খেলাটির স্মৃতি মোটেই সুখকর নয়। ওরা যে কেন বার বার আহত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল তা কারও বোধগম্য হয়নি, সম্ভবত আধুনিক ফুটবলের এও এক স্ট্র্যাটেজি। কিন্তু সেদিনের রেফারি সুধীন চ্যাটার্জি এটাকে ভাল মনে নেননি।

এই দুটি দলকে বিদায় জানাল আই এফ এ এক সান্ধ্য-ভোজের মাধ্যমে। দু' দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা হাজির ছিলেন— আই এফ এ তাদের আপ্যায়ন করল, তুলে দিল হাতে হাতে নানা উপহার। সম্পাদক অশোক ঘোষ সহ কর্তারা ওদের আন্তরিকতা দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেও অনেকেই বললেন ওরা বোধহয় আর আসছে না এখানে খেলতে। কেন? এ প্রশ্নটা জেনে নেবার ইচ্ছা ছিল অনেক সাংবাদিকের, যারা সেদিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বাধা অবোধ্য ভাষা। দোভাষীর মাধ্যমে যে কথাবার্তা সম্ভব তা' দিয়ে কি অন্তরের কথা জানা যায়?

★

শিল্ডের কোন খেলায় বিজয়ী মোহনবাগান দল-নায়ক দিলীপ পালিতকে খেলতে দেখা যায়নি। মোহনবাগানের প্রথম খেলা ছিল কালিঘাটের বিরুদ্ধে, দিলীপ বসে ছিল জার্সি গায়ে সাইড লাইনে। পরের খেলা মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে ও নাকি খেলা দেখেছে বাড়িতে বসে টিভি-তে। ফাইনাল খেলা দেখার ওর খুব ইচ্ছা ছিল মাঠে এসে। কিন্তু সেদিন ওকে কেউ মাঠে দেখেনি। কিন্তু কাগজে বিজয়ী দলের ছবিতে তাকে দেখা গেল। ওর বন্ধুদের ভাষা; দিলীপ প্রথম খেলায় এসে বুঝতে পারল শিল্ড খেলা তার ভাগ্যে নেই। কাগজে কোচ পি কে-র বিবৃতি ওকে বিব্রত করল। ক্লাবের স্বার্থে, কর্মকর্তারা যাতে কোন সমস্যায় না পড়েন তার জন্য নিজেকে সরিয়ে নিল দিলীপ। ক্লাবের জনৈক কর্মকর্তা, যাকে দিলীপ অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করে তার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত কেবল গ্রুপ ছবিতে নিজের অস্তিত্ব রেখে আবার দূরে সরে গেল। কলকাতা ফুটবলের এও এক বড় নিজস্ব চরিত্র।

রমার প্রাপ্তিযোগ

কলকাতা খো খো ও হাডুডু ক্লাবের কবাডি-তারকা রমা সরকারকে ওর ক্লাব একটা সাইকেল উপহার দিল। রমার খেলার জন্যই নয়। ক্লাবের সদস্য ও পরিচালকরা রমার ব্যবহার, তার প্রয়োজন সব দিক বিবেচনা করেই এই উপহার দিলেন।

রমা থাকে চাকদা। স্টেশন থেকে বেশ কিছু দূরে ওর বাড়ি। সাইকেলটা পাওয়ায় ওকে আর রোজ কলকাতা আসবার জন্য হেঁটে ট্রেন ধরতে হবে না। রমা খুসী, ও ক্লাবের কাছে এর জন্য কৃতজ্ঞ।

কাজমার এক আহত খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে আনতে রেফারি সুধীন চ্যাটার্জিও হাত লাগিয়েছেন/স্পট নিউজ



এদেশের ফুটবলে অভাব টাফনেস ও সারা মাঠ জুড়ে খেলার

অশোককুমার দাশগুপ্ত ঃ পার্ক হোটেলের চারতলার এক ঘরে দক্ষিণ কোরিয়া ফুটবল দলের 'ডাইরেক্টর' স্যাংহুন পার্কের সঙ্গে ফুটবল সংক্রান্ত আলোচনার চেষ্টা চলছিল। আমাদের দু'জনের মাধ্যম ছিলেন দোভাষী কোরিয়ান যুবক বি এস ইউ। ঘরের এক কোণে একটা ব্ল্যাক বোর্ডে আঁকা ছিল ফুটবল মাঠের পুরো ছবি, আর তার উপরে লেখা ছিল ৪-২-৪, ৪-৩-৩। আলোচনার মাঝে মাঝেই মিঃ পার্ক তার নোটবই খুলে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করছিলেন আর লিখছিলেন।

রাজস্থান আর এরিয়ানকে হারিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া তখন ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি। পরের দিন খেলা। গভীর আলোচনার মধ্যে নোটবই-এর প্রতি বেশী গুরুত্ব দেখে জানতে ইচ্ছা হ'ল, নোটবই-এর ব্যাপারটা। মিঃ পার্ক নোটবই দেখে দুটো নাম করলেন, 'ডেভিড আর সুরজিত।' সামনে পড়ে থাকা 'খেলার আসরে' সুরজিতের ছবি দেখিয়ে পরিচয় করিয়েছিলাম সুরজিতের সঙ্গে। সুরজিত যে একজন নামী এবং বড় খেলোয়াড় তাও জানালাম। মিঃ পার্ক বইটা হাতে তুলে নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে সুরজিতের ছবি দেখে কি যেন বললেন আর হাসাহাসি করলেন। ভাবটা অনেকটা এইরকম, 'তোমার মত অনেক সুরজিতকে দেখা আছে।'

নিছক ঠাট্টা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ ওরা নিজেদের নিয়ে নিজেরা মোটেই গর্বিত নয়। বরং ওরা মানুষ হিসাবে ভীষণ ভালো। ভারতীয়দের সম্বন্ধে ওদের অগাধ শ্রদ্ধা। আর ভারতীয় ফুটবলের ব্যাপারে ওরা বিস্মিত। ওরা ভারতীয় ফুটবল সম্বন্ধে যা জেনেছিল, সেই ধারণা যে ভুল, তা ওরা এখানে না এলে বুঝতে পারত না।

দুটো ম্যাচ খেলে ওরা যা বুঝেছে, সেই ব্যাপারে মিঃ পার্ক বললেন, 'কোরিয়ানদের থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য ভাল। ড্রিবলিং, ট্যাকলিং ইত্যাদি সত্যিই সুন্দর।' কিন্তু আধুনিক ফুটবলের যুগে টোটাল ফুটবলের অভাব মিঃ পার্কের চোখে পড়েছে। 'সারা মাঠে ফুটবলটাকে ছড়িয়ে দিয়ে খেলতে চায় না এখানকার ফুটবলাররা। আর একটা জিনিসের অভাব আছে, তা হল 'টাফনেস'। জানালেন মিঃ পার্ক।

দক্ষিণ কোরিয়ার এই দলে ছিলেন, তিনজন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়। স্টপার হ্যাং জ্যাং ইউস, সেন্টার হাফ হ্যান বুন বেং, আর রাইট আউট হ্যান কে বং। প্রত্যেকের বয়েস পঁচিশের মধ্যে। (বয়সের ব্যাপারে এদের একটা কুসংস্কার আছে। এরা সবসময় এক বছর বাড়িয়ে বলে)।

কোরিয়ানরা প্রত্যেকেই বেশ হৈ চৈ করতে ভালবাসে। আর ভালবাসে 'থেকোন' লড়তে। চীনাদের যেমন 'জুডো', জাপানীদের 'ক্যারাটে', তেমনি কোরিয়ানদের 'থেকোন'। প্রতিটি কোরিয়ানকে এই 'থেকোন' শিখতেই হবে। মোটামুটি 'থেকোন' এদের প্রত্যেকের 'হবির' মধ্যে পড়ে।

এবারে আই এফ এ শিল্ড খেলতে এসে কলকাতার দর্শক, কলকাতার ফুটবল প্রীতি ওদের খুশী করেছে। আবার ওদের ইচ্ছা আছে কলকাতায় এসে খেলে যায়।

সেদিন আর বেশী কথা হয়নি। কারণ পরের দিন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে সেমিফাইনালের গুরুত্বপূর্ণ খেলার জন্য তখন ওরা প্রত্যেকেই চিন্তিত, ব্যস্ত।

দেখা হয়েছিল সেমিফাইনালের পরের দিন। ওরা তখনও ক্লান্ত, হেরে যাওয়ার দুঃখ তখনও সবার মনের মধ্যে। টাইব্রেকারে হেরে গেলেও ওরা ইস্টবেঙ্গলের প্রশংসা করেছিল। সুরজিতের নাম করতে মিঃ পার্ক দোভাষী মারফৎ জানালেন 'সুপার্ব'। কিন্তু মিঃ পার্ক বুঝতে পারলেন না, এদেশে এমন ভাল খেলোয়াড় থাকতেও ভারতীয় ফুটবল কেন এত পিছিয়ে?



কোরিয়ার কোচ, অধিনায়ক ও কয়েকজন কর্মকর্তা কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে বাঁদিকে আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষ

মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদি প্রকাশনী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত